



१७८१

ବର୍ଷ—୫

सं० २४—२४

With best compliments from :

Phone : 23-0445

Gram : NIASURANCE

Telex : 7294

Registered Office :

New India Assurance Building

87, M. G. ROAD, FORT, BOMBAY-1

শারদীয়ায় আহ্বান জানায়—

আধুনিক কচিসম্মত সকল প্রকার ডিজাইনের রাউজ ও অফে
খুচরা বিক্রো



শ্রীযা ষ্টোর্স

ষ্টেশন রোড (পশ্চিম) নল-বারাকপুর, ২৪ পুরগণা

বিঃ দ্রঃ — স্কুলের সমস্ত প্রকারের পোষাক পাওয়া যায়।

আমাদের দোকানেই পাবেন রেম বোনাস টিকিট

With best compliments from :



SUBHASH ENTERPRIS

18 D, Sukeus Lane

Calcutta-1

শারদীয়া কিশলয় এর ঘেলা



: পরিচালনায়
কিশলয় সব পেয়েছির আসর

নব বারাকপুর ২০ পরগণা।

*With the
best Compliments
of*

A WELL WISHER

DO
YOU
KNOW

CENTRAL BANK OF INDIA

HAS SCHEMES TO ASSITS :

- AGRICULTURISTS
- SMALL SCALE INDUSTRIALISTS
- EXPORTERS
- SELF EMPLOYED PERSONS
- CONSUMERS
- TRANSPORT OPERATORS
- RETAIL TRADERS
- STUDENTS

FOR DETAILS ENQUIRE AT ANY BRANCH

CENTRAL BANK OF INDIA

*Central Office : MAHATMA GANDHI ROAD,
BOMBAY-1*

“কলে স্বরণে”

কলিনাথ মজুমদার : আসরের অত্যন্ত মনোহারী কাঠি । কিছুকটা বলবার সুবিধার জন্যে, কিছুকটা আদরের অভিযুক্তিতে—আমরা যাকে ডাকতাম—“কলে”—সে হারিয়ে গেল । চিরতরে ।

বহুস্মৃতিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বরের অভিষেক সন্ধ্যা । টগবগে কিশোর আনাদের কলে চুপটনার বলি হ’লো বনগাঁগামী একটি ট্রেনের ।

পবন এলো প্রায় রাত আটটায় । সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন অনেকটাই । আসরের কর্মীরাতো বটেই । শুরু হয়েছিলো তার দেহাতীত দেহ ঘিরে, ভোরের উদ্দেশ্যে রাতে অতল প্রহরা । শুক্রবার গোটা দিন আর রাতের অর্ধেকটা পর্যন্ত অবিরাম আটনাছুগ এবং প্রথাগত অগুষ্ঠান সম্পন্ন করে ফিরে এলেন সবাই । শুধু “কলেট” আর এলো না ।

‘আসর’ যেন একটি পরিবার । মনোহারী কাঠি ভাই-বোন, কর্মী, অভিভাবক এবং শুভাধারী,—এদের প্রত্যেককে নিয়েই এটি পরিবারের বিস্তার । শুধুমাত্র একজন সভ্যের অকাল বিয়োগ ও যে—পুরো একটি পরিবারকে শোকে মুহূর্তে করে তোলে,—তারই অভিযুক্তি লক্ষ্য করা গেল সমস্ত সভ্যদের চোখে মুখে—আচরণে । ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে কয়েকটা দিন রাত । আজও এক অব্যক্ত ব্যথায়, এক তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে বুকের ভিতরটা যেন টুন্টু করে ওঠে । চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলের গুপ্তি মাখানো হাস্যময় মুগটি ।.....

কলের শোক-সম্প্রদ পরিবারকে সাযুনা দেবার ভাষা আমাদের নেই । কামনা করি, এ নিপর্নায়কে সহ্য করার শক্তি তাঁরা অর্জন করুন ।

মুহুর্তে আমাদের করে কোথায়, কোন লোকে, জানি না । যেখানে, যে পরিস্থিতিতেই সে থাকুক, প্রার্থনা করি, চির পরিচিত তার সেই গুপ্তি ভরা হাসিটি যেন অগ্নান থাকে ।

With Best Compliments from

EASTERN PAPER MILLS LIMITED
ENGINEERING DIVISION

India's Leading Manufacturers of Machines
for Pulp, Paper and Board Mills,

Works & Office :
2, DAKSHINDARI ROAD,
CALCUTTA-48

Cable : EASTRNPAPR

Phone : 57-2736/37

With Compliments of

ESTD. 1935

DIAL : 226750 (on request)

SUNBEAM WATCH CO.

2/1, OLD COURT HOUSE CORNER,

(National Tobacco Building)

CALCUTTA-700001

With best compliments of :

F. AHMED & CO.

Exporters & Importers

48, Baithakkhana Road,

Calcutta-9

॥ পূজা সঙ্কলন ॥

কিশলয়

এর

মেলা

রেজিঃ নং

আর এন ১৮৪২/৭১

অঃপ্রিন ও কাট্রিক

বর্ষ—৪



১৩৮১



সংখ্যা—২৪

॥ পত্রিকা উপসমিতি ॥

সভাপতি

মহাকার নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

দার্থ্য সম্পাদক

পুলক চৌধুরী

বিজ্ঞান বিভাগীয় সম্পাদক

প্রজিত চৌধুরী

প্রকাশক

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

সম্পাদক

নিপিজেন্দু চক্রবর্তী

বিভাগীয়

প্রবোধ দানাজী

দার্থ্যের আসন্ন সম্পাদিকা

রত্না ভট্টাচার্য

সাধারণ সভা

কমলা রঞ্জন বিশ্বাস, তড়িৎকাছ

রায়, আশীষ বিশ্বাস

প্রচ্ছদ—শ্রী অরুণা বণিক



এন.বি.মেডিকেল ইল

সমস্ত প্রকার ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী পাওয়া যায়

ডাঃ বোসের লেবরেটরী

রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

নববারাকপুর

হোমালের পশ্চিম পাশে

ফোন-৪৭২৮৮০

২৪ পরগণা জেলায় স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থান প্রকল্প ও অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কর্মসূচীর কাজ এগিয়ে চলেছে :—

- জেলার প্রগতিশীল বেকার শিক্ষিত যুবকরা কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকস্টাইল, রসায়ন সিরামিক ও অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে নতুন নতুন শিল্প সংস্থা গড়ে তুলেছে।
- ৬৩৭টি প্রকল্প অনুমোদন করা হ'য়েছে।
- ২৭৮টি প্রকল্পের কাজ শুরু হ'য়েছে।
- ৬৬০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক প্রকল্পের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ২২ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হ'য়েছে ব্যাঙ্ক থেকে।
- ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে।

বাবসা করতে গেলে মূলধন লাগে প্রয়োজনীয় মূলধনের ৯০ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন আর্থিক সংস্থা থেকে পাওয়া যায়। বাকী ১০ শতাংশ সরকারী ঋণ হিসাবে পাওয়া যায়।

বিশদ বিবরণের জন্য আলিপুরস্থিত ২৪ পরগণার জেলা শাসকের অফিস পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের স্পেশাল অফিসারের (ফোন নং ৪৫-২৪৫০) সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য জমসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত



TECHNO COMMERCIAL ENTERPRISE

General Order Suppliers, Specialized in Mining spare
Parts, Printing Materials and Accessories.

**9, PANCHANANTOLA ROAD,
CALCUTTA-19**

Telegram :
MILLGOODS

{ Office :
Resi :

Indian Rice Mill Stores

Mfg. of I.R.M.S. Brand Rice Huller & Parts
General Hardware & Machinery Merchants.

**11/A, NETAJI SUBHAS ROAD,
(GUPTA MANSION)
CALCUTTA-1**

Work Shop

**36/4, HARACHAND MUKHERJEE LANE
HOWRAH.**

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ-সমিতি-কলিকাতা-১৯২১

“কিশলয়ের মেলা”র ছোট ছোট
ভাই বোনেদের জন্ম রইল আমার
শারদীয়া অভিনন্দন—

—অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়
বরানগর, কলিকাতা।

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ-সমিতি-কলিকাতা-১৯২১

ফেনি : ৫৫-৭১২১

ভরুণ অপেরা

১১৩ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

এবারের বলিষ্ঠ শারদীয়া অর্থা

মাও-সে-তুং

রচনা ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত

সুর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য

বিপ্লববহি

রামবিহারী

রচনা—অনল গুপ্ত

সুর—জর্জ। সেন

পরিচালনায়—সমীর মজুমদার

শ্রেষ্ঠাংশে—শ্যাম্ভুগোপাল

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ-সমিতি-কলিকাতা-১৯২১

স্মৃতিস্মরণ

সম্পাদকীয়

কবিতা

শানাই বাজে আজ	॥ রঞ্জিত বিকাশ বন্দোপাধ্যায়	॥ ৩
শরৎ এসেছে	॥ সু-মো দে	॥ ৩
উদাসীন	॥ মনোজিৎ বসু	॥ ৪
প্রশ্ন	॥ সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী	॥ ৫
পরাকার পায়তাড়া	॥ স্বপন বূড়ে	॥ ৬
তরুণ সাথী	॥ গোপাল ভৌমিক	॥ ৭
ম্যানিফেস্টো	॥ ঠেকবাল হাসান	॥ ৭
চল নির্ভয়ে	॥ শাহুশীল দাস	॥ ৮
বর্ষা আসে কেন-	কৃষিকেন্দ্র পাল	॥ ৯
৮। পুতুলের বিয়ে	॥ অম্বপকুমার দত্ত	॥ ১০

স্মৃতিস্মরণ

আমাদের শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করণ :

উৎসবে আমকে নিত্যপ্রয়োজনে

গৌরী শঙ্কর বস্ত্রালয়

জুজ, ষাট, ষাটরাউজ, ব্রেসিয়ার, সায়া, জামা, বড়দের জামা, টেরিকট জামা, গেঞ্জি, জাকিয়া, পাণ্ট লুজি প্রভৃতি আধুনিক রুচিসম্মত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান।

নব-নারায়ণপুর, পুরাতন বাজার (বেক বিল্ডিং) ২৪ পরগণা।

। পরীক্ষা আর্থবীয় ।

স্মৃতিস্মরণ

তুটু	॥ সনাতন চক্রবর্তী
লিমেরিক	॥ বারীণ বসু
ছটি লিমেরিক	॥ নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী
পূজা	॥ শঙ্কর দে মহরী

ইতিকথা

মা দুর্গার কথা শোন

ইতিহাসের গল্প

বাঘা যতীনের আদিকথা ॥ পুলকেশ দে সরকার

প্রসঙ্গ কথা

লেটিল মাগাজিন সমস্যা

ও বড়হস্ত কালিদাস ভট্ট

বিজ্ঞান কণিকা

৷ সৃজিত চৌধুরী

সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্যামা বিবেকানন্দ

॥ রেণা চক্রবর্তী

কণিকা

উত্তরণ

॥ মুক্তিকুমার বসু

॥ ৩৯

Phone :

KALIKA IRON STORES

IRON & STEEL MERCHANTS

ACC & KONARAK CEMENT

Dealers in—STONE CHIPS, JAMA CHIPS, BRICKS, SAND
OXIDE COLOURS & ALL KINDS OF BUILDING
MATERIALS SUPPLIER

17/19, R. G. KAR ROAD, CALCUTTA-4

গল্প

রাণাঘাটের মাল	বিক্রপাক
বাণেশ্বর ডাক	কাশীনাথ পাল
চারার চাড়	॥ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিচিত্র মাহ শিকার	তড়িৎকান্তি রায়
ভূত-বাগানের গল্প	বলীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়
কমিকের স্মৃতি	॥ সাতোলাল কর
উড়িয়েট	॥ জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাস
মেলা	॥ ক্রীধীমান

ছড়া

এক ছুট তিন	॥ সরল দে	॥ ৬৭
রামহাগলের নাচ	॥ মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী	॥ ৬৮
অথ চিড়ি কথা	॥ গোপাল দাস কাব্যভারতী	॥ ৬৯
মাসির ভড়া	॥ দীপা চক্রবর্তী	॥ ৭০
ধরা পড়ছি সবাই	॥ পূর্ণেন্দু বসু	॥ ৭০
মজার খবর	॥ সুনীল দাস	॥ ৭১
মাতুরাড়া	॥ হরেন ঘটক	॥ ৭২
৮। পরমাণু	॥ শুভেন্দু ঘোষ	॥ ৭২

পুরস্কার প্রাপ্ত ও উচ্চ প্রশংসিত একত্রে দুটি একান্ত রহস্য নাটক।

মাকড়সা ও নীল চশমা

রচনা—নাট্যকার নরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রকাশে :—প্রতিমা প্রকাশ ভবন

৪৪, জগদীশ বসু রোড নববারাকপুর

২৪-পরগণা

মাটক

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সার্কাস

অভিমুখের দর্পণে

আমাদের কথা

ধাঁধার আসর

আসর সংবাদ

আমরা তাইবোনেরা

কবিতা ও ছড়া :—

(১) এবারের পূজা

(২) আমান কবিতা

(৩) শুধু ভাত দেব

(৪) মজার কথা

(৫) বাজনা

(৬) এশিয়া

(৭) বরষা

(৮) জলছাড়া

(৯) কেমন হয়

গল্প :—

(১) বন্ধুর জন্তে

(২) স্বাধীনতা

॥ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

॥ তপন চৌধুরী

অভিমুখ

কমলারঞ্জন বিশ্বাস

রক্তা ভট্টাচার্য্য

পুলক চৌধুরী

॥ চঞ্চল চক্রবর্তী

স্বর্গা বসু

জয়দেব চক্রবর্তী

॥ কানন দাস

স্বপ্না দাস

গৌতম দত্ত

স্বাতি বসু

নির্মলকুমার সরকার

পম্পা সিংহ

॥ সিতাংশু বিশ্বাস

॥ ৩০

॥ ভবোত্তোষ বিশ্বাস

॥ ৩৪

Space Donated by :

Phone : 35-3987

Oil India Lubricants

226A, Bugmari Road,

Calcutta-700054

Manufacturers of All Types of Grease and Lubricating oils.

Specialist in "Wheel Bearing Grease"

সম্পাদকীয়



বর্ষ — ৪
সংখ্যা — ২৪
১৯৮১

“কিশলয়ের মেলা” তাঁর কচি পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এক থেকে আর এক নতুন সেতুর দিকে। শিশু ও কিশোরদের সাহিত্যকে অবলম্বন করে সেতুর পুর সেতু ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করা, সে যে কি অপারিসীম কঠিন কাজ, তা সামান্য সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশ করা সহজ সাধা নয়। তবু শিশুদের সহজ সরল, মিষ্টি চাহনী আর মধুর হাসি মাতোয়ারা করে তোলে প্রকৃতির জননী মনকে। সমস্ত কষ্ট, সমস্ত সমস্যাতে দূরে নিক্ষেপ করে আমরা এগিয়ে চলি তাদের মিষ্টি মধুর হাসির প্রাক্তনে। তাইতো দেখি শরৎ আকাশে ভোরের অরুণ আভায় শিশির স্বচ্ছতায় ঝলমল শ্রামশল্প কচি কচি দুর্বাদল। নিউলি ফুলের স্পর্শ, সুন্দরতায়, জাগিয়ে তোলে সকলের মনে এক আনন্দের মধুহিল্লোল। বিশ্বকবির মন বৃষ্টি মেতে উঠেছে শরৎ-অরুণ-আভায়। তাইতো তাঁর কণ্ঠে অহুসিত হয়ে ওঠে—

“শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী
ছড়িয়ে গেল জাগিয়ে মোহন অঙ্গুলী।”

এই শরৎ-এর মোহন বাঁশীর আহ্বানে দশভূজা দশপ্রহরণ ধারিণী আবির্ভূতা হন, আমাদের দুঃখ, বেদনাহত মনকে আনন্দে ভরে তুলতে। মায়ের আগমনে আমাদের সমস্ত শ্রানি সমস্ত আশঙ্কনাকে তুচ্ছ করে আমরা সবাই মেতে উঠি অনাবিল আনন্দে।

সৃষ্টির প্রথম কল্পে অশ্বরদের অত্যাচার অবসানে দশভূজা আবির্ভূতা হয়েছিলেন। মহাদেবীর দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণীবিজ্ঞা বিজ্ঞানদায়িণী, বলরূপী কান্তিকেয়, বামে কার্যসিদ্ধি-দাতা গণেশ ও বীরেন্দ্র কেশরী। আজো আমরা ও আমাদের শিশুরা মহামায়ার মহাষ্টমী পূজার দিনে পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে মহা সমা-রোহের মধ্য দিয়ে মাঝে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পূজা করি। আমার ছোট

ছোট ভাই বোনেরা মাতৃশক্তিতে অমুপ্রাণিত হয়ে নানা কার্যে
শক্তিমান হয়ে উঠবে। আজকের দিনে এই আমার প্রার্থনা।

“প্রভাত সূর্য, এসেছে রুদ্র সাজে
হৃৎখের পথে তোম'র তূর্য বাজে,
অকণ বহি জ্বালাও চিত্ত মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।

তোমারি হউক জয় ॥”

শায়দীয়া “কিশলয় এর মেলা” প্রকাশে আসর কর্মীদের অক্লান্ত
পরিশ্রম আমাকে ধন্য করেছে। আসর সভাপতি মুক্তি বন্দু, সংঘমিত্র
কমলা রঞ্জন বিশ্বাস, সহ সংঘমিত্র তড়িৎকান্তি রায়, পত্রিকা সভাপতি
নাট্যকার নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনীল চক্রবর্তী ও শশাঙ্কভূষণ রায়ের
সহায়তায় আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

আন্তরিক আস্থা ও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের ঋণী করেছেন
তাদের সারগর্ভ লেখনী দিয়ে আর যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা
প্রকাশে সহায়তা করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অবশেষে পত্রিকা প্রকাশের ক্রটি বিচ্যুতির আশঙ্কায় পাঠকের
কাছে ক্ষমার ক্ষেম স্পর্শ কামনা করি।

তুঃ

সঃ

পোঃ

আঃ

: নিয়মাবলী :

॥ কিশলয় এর মেলা ॥

নব বারাকপুর অঞ্চলের একমাত্র শিশু ও কিশোর সাহিত্য
মাসিক পত্রিকা।

বার্ষিক—৩০০, ৪৫০ (ডাক সহ)।

যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

লেখার সহিত ২৫ পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

যে কোন বিষয়ে যোগাযোগের জন্ত ডাক টিকিট প্রয়োজন।

লেখা মনোনীত হইলে প্রকাশ করা হয়। [প্রয়োজনে লেখা
অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না।] পরিবর্তন করা হয়।

শিশু ও কিশোরদের উপযোগী লেখা গ্রহণ করা হয়।

চিঠিপত্র ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :

সম্পাদক—নিখিলেন্দু চক্রবর্তী,

৪৪, জগদীশ বন্দু রোড, পোঃ—নব বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

সুখবিতা

॥ শানাই বাজে আজ ॥

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশলয়ের মেলার মাঝে,
জাগলো সাড়া সকল কাজে,
শরৎরাণী সবার মা যে,
অকাল বোধন তাই।
পদ্ম কোটে, শিউলি ঝরে,
কাশের ফুলে হাওয়া করে
চামর যেন ঢুলায় ওরে,
চারদিকে রোশনাই ॥

কদম কেয়া ফুটলো যত,
সাজায় মাকে সবাই তত,
মায়ের হাসি মনের মত,
চুমকি জরির সাজ।
বাচ্চ, সুমি, খোকন, তুলি,
সবাই সাজে বায়না ভুলি,
চায়না কেহ থাকুক ভুলি—
বাজছে শানাই আজ ॥

॥ শরৎ এসেছে ॥

সু - মো - দে

সাদ মেঘের ভেলায় চড়ে
শরৎ এসেছে।

শিউলি কাশের পরস্পরের
জীবন ভেঙেছে।

হরিৎ বরণ জুব্বোঘাসে
হিমের কণা যুক্তো হাসে,
হিরণ রবির মিষ্টি রোদে
ভুবন ভরেছে।

আমলা আউশ সোনালী ধান
আগমনীর গায় জয়গান,
বোধন সুরে ভৈরবীতে
শানাই বেজেছে।
সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে
শরৎ এসেছে।

কিশলয়ের মেলা ॥ ●

॥ উদাসীন ॥

মনোজিৎ বসু

আলো-ঝলমল সুনীল আকাশে
রূপালী মায়ার হাতছানি,
বাতাসে বাবুল শিউলি-সুৰভি ;
মন তবু কেন উদাসীন ?

কত-না হাসির চমক ছড়ায়
ঝিকিঝিকি ওই তারাদল ;
কত গান গায়, নেচে নেচে যায়
চির যৌবনা তটিনী ।
মন তবু কেন দেয় নাকো সাড়া ?
নিথর নীরব একেলা !

নয়ন যে তার অঙ্ক হয়েছে,
অবগ্ন হয়েছ বকু ;
মন আজ তাই বাইরে যে নাট,
অস্তুরে হ'লো লীন সে ।
প্রষ্টার প্রতি হয়ে তদ্বয়, সৃষ্টিতে উদাসীন ॥

৩শরদীয়া অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

মায়া রেডিও

নব বারাকরপুর, ২৪-পরগণা

॥ প্রশ্ন ॥

সমরেন্দ্র গান্ধী

দুর্গাপূজা ভারি মজা

বহুরেতে একবার ।

কত সাজ, কত আলো

সবইতো দেখবার ।

পাড়ার ছেলে, সব ফেলে

আদায় করে চাঁদা ।

লোকজন করে না বারণ

দেয় না কোন বাধা ।

মণ্ডপে বাজে, দিন রাত

হিন্দী ছবির গান ।

ছোটরা সব করে হৈ হৈ

ভোটায় খুলির বান ।

চারদিন পূজা, করে দশদিন

পায় না কোন বাধা ।

ভাবনা কিসের, টাকা লাগে

আবার নেবে চাঁদা ।

থাকুক খরা, চলুক বহু

অতশত কে ভাবেছে ।

ভাবার লোক অনেক আছে

পূজা কি আর আসছে ?

প্রশ্ন শুধু আমার মনে—

“এ ভাবেই কি চলবে ?

নীরব ভাবা সবই হয়ে

মুখটি কবে খুলবে ?”

Phone : 35-5566

The Eastern India Office Stationers

Office :

27/2, Jugai Kishore Das Lane. (Chattabagan)

Calcutta-6

Dealers in :

Office Stationeries, Files, Envelops, Clip, Blotting Paper,

Gum, Gems Clip, Writing Ink, Pencil, Refil (Caravan)

Rubber & Stamp Makers Etc.

কিশোরের মেলা ॥ ৫

॥ পরীক্ষার পায়তারা ॥

স্বপন বুড়ে।

পরীক্ষা দেবো তাই পায়তারা কসি রে ...
রাশি রাশি বই নিয়ে জোড়াসনে বসি রে !
খাতা খুলে লিখে চলি—মাথা ঘোরে বন্ বন্
কতু পড়ি, কতু ভাবি, পাইচারি অগনন !
মগজেতে ঠেসে দি Made Easy-র মাল্পো
পাঠোর নৌকোয় চেপে ধরি হাল ত !
ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোলে—
মিলে-মিশে আমি ভাই পড়ে যাই কী গোলে !
ঘন ঘন কফি খাই, নাকে ঠাসি নস্টি—
সারারাত পড়ে পড়ে হবে! জলে ভস্মি !
পেট করে ভুট ভাট কাবু চোয়া ঢেকুরে
একাকার করে ফেলে কুকুরে ও মেকুরে !
কখনো বা চোখে ভাসে মাঠ ভরা সর্ষে
পাগলের মতো কতু গান গাই হবে ।
কেবা কয় কানে কানে, টুকে পাশ ধরবি—
কেন মিছে পড়ে পড়ে দেহ কালি করবি ?
সেই থেকে পড়াশোনা এক দম বন্ধ—
রোগ্যাকে আড্ডা মারি—তাতেই আনন্দ !

— — —

শিশুর জীবন গড়ে ওঠে একমাত্র
শিশু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ।

॥ তরুণ সাথী ॥

গোপাল ভৌমিক

তাজা ও তরুণ রক্তে

সর্বদাই থাকে বরাভয়,
বাধার প্রাচীর তুলে

ঘটাতে চাইলে পরাজয় ।

ফুলে ফুলে উঠবে সে

খেলবে সে ভাঙনের খেলা,

বিস্ময়ের আছে কিছু

তেজোরশ্মি মান হেলা ফেলা ?

অতএব চার দিকে

পথ যদি খুলে রাখি ঠিক,

প্রাণের বিকাশে পাব

ভারুণ্যের আলো ঝিক মিক ।

হোক না দামাল ছেলে

দস্তি মেয়ে হয় হোক যারা,

আশুক জোয়ার গাঙে

মরা প্রাণে যৌবনের সাড়া ।

ভুল করে সেও ভাল

নয় ভাল, মুখ বুঁজে থাকা,

না এগোলে ঝড় জলে

চলবে কি প্রগতির ঢাকা ?

॥ ম্যানিফেস্টো ॥

ইকবাল হাসান

এই শোন, কাছে আয় হোক আজ সন্ধি,

তোর হাতে এই হাত হোয়ে যাক বন্দী ।

ঋগড়ায় কিবা লাভ বেড়ে যাবে খুনোখুনি

রক্তের ডেস্টা,

চারিদিকে হাহাকার, কান্নার শব্দে ভরে যাবে

সবুজ এই দেশটা ।

তার চে' কাছে আয় হোক আজ সন্ধি,

তোর বুকে এই বুক হোয়ে যাক বন্দী ॥

কিশোরের মেলা ॥

॥ চল নির্ভয়ে ॥

শান্তশীল দাস

আকাশ ঢেকেছে কী ঘন অন্ধকারে !
সে আধার মাঝে ঘোরের ফেরে শয়তান ;
কত অঘটন ঘটায় সে বারে বারে,
দাপটে তাহার এ-মানুষ ত্রিয়মান ।
শয়তান জয়ী হয়নিকো কোনদিন,
কেটে যাবে এই আকাশের ঘন কালো ;
জাগবে মানুষ, কাটবে এ ছদ্মদিন ;
রাত্রির শেষে স্নিগ্ধ প্রভাত আলো ।
অস্তরে চাই অভয় মন্ত্রখানি,
শক্তি সাহস হুজুয় দেহ মনে ;
ভীরু শয়তান নেবে পরাজয় মানি,
সুন্দর চিরজয়ী সত্যের রণে ।
নির্ভয়ে চল সমুখ পথ পানে,
মুখরিত কর সেই পথ গানে গানে ।

— — —

গম কল

বিহালি কল

ভাল গম ভান্ডাতে ও বাজারের অপেক্ষা বিশেষ সুবিধা দরে
বিহালি ক্রয়ের অঙ্কে আশ্রন—

“লক্ষ্মী নারায়ণ ফ্রাওয়ার মিল-”এ

নব-বারাকপুর স্টেশন (পশ্চিম)

(কাছুদার গমের দোকান)

॥ বর্ষা আসে কেন ॥

কৃত্তিকেশ পাল

ঐশ্বের পর বর্ষা কেন—আসে বলতে পারো ?
এর উত্তর কি কি হ'বে—ভেবে বা'স্তব করো ।
“ভেকের ডাকে বর্ষা নামে” তোমরা যদি বলো ;
আমি বলবো, “আরো কথা — শুনবে যদি চলো”
গরমেতে প্রাণটা যখন—করে হাঁই-ফাঁই,
সবার মুখে একই কথা—বৃষ্টি এখন চাই ।
বৃষ্টি ভেজা নরম মাঠে—চাষী করে চাষ,
মিঠে জলে জেলে ধরে—হরেক রকম মাছ ।
ধান-গম সোনার কসল—হ'লে মাঠে ভাই,
সারা বছর খাবার-দাবার—তাইতে মোরা পাই ।
সারি সারি পিঁপড়ে দেখে—নিতে পারো ভেবে,
একটু পরে হয়তো এবার—বৃষ্টি কোথাও হ'বে ।
গুণী জনে কিন্তু আরো—মজার কথা বলে,
বন-জঙ্গল বৃষ্টি নাকি—নামায় ধরাতলে ।
রান্না হয়ে পুড়ে গেছে—গাছেরা গরমকালে,
বর্ষাতে সব সবুজ, যেন—টিয়া বসে ডালে ।
প্রকৃতিকে সজীব করা—বৃষ্টিধারার কাজ,
সুন্দর আকাশ তাইতো পরে—কালো মেঘের সাজ ।

—

॥ পুতুলের বিয়ে ॥

ଅନୁପ କୁମାର ମହା ।

বড় হয়েছে প্রভুল যেয়ে

ভাবছে বসে যিনি

বিয়ে এবার দিতেই হবে

ଥୁଁ ଉଠେ ହବେ ବରଧାନି ।

ও পাড়ার পুতুল-যত্ন

ବୟସଟା ତୋ! କ'ଣ ନୟ,

থক তাঁরে বসতে না পারে

কেবল ঘরে বসে রয় ।

খোঁজ পেল মিনি, আছে

একটা ছেলে এ-দেশে,

আসল খুক-খুক, মেয়ে দেখে

পাছন্দ হ'ল শেষে ।

বিয়ের দিন সকাল থেকে

নেইকো কাজের জুড়ি,

এটা আছে ওটা নেই

করছে সবাই ছডোছডি ।

তাড়াতাড়ি হলো। বিয়ে

চিলে কোঠার ঘরে

পারবে না। তার ছোট্ট মেয়ে

ধাকতে উপোস করে ।

পুতুল মেয়ে বরের সাথে

যাবে স্বস্তির বাতী

বাক্স দিয়ে তৈরী নতুন

যজ্ঞার মোটর গাড়ী ।

কিশলয়স্বর থেলা ॥

॥ দুস্ট ॥

সনাতন চক্রবর্তী

দস্ত বাড়ির বাবিন্ সোনা
বাচ্চাটি ফুট ফুটে,
দেখতে বেজায় শাস্ত হলেও
ছুটু সে মিট মিটে ।
সকাল বেলা মায়ের কাছে
পড়তে বসে রোজ,
চুপটি করে থাকবে বসে
মুখটি করে গোঁজ ।

মা যদি কন, বাবিন্ কেন	ওঘর থেকে একটু ওষুধ
চুপটি করে রও ?	ছুটে যদি আনো,
বাবিন্ বলে পড়ব আমি	পড়তে তবেই পারব আবার
কেমন করে কও ?	এই কথাটি জেনো ।
রাতের থেকেই পেট-টা আমার	তাই না শুনে যেমনি মায়ের
করছে কেমনতর,	ওঘর পানে যাওয়া,
মনে হচ্ছে পেটের ভেতর	স্বযোগ স্বস্থে বাবিন্ বাবু
অশুখ গুরুতর,	ফুরৎ করে হাওয়া ।

॥ লিমেরিক ॥

বারীন বন্দু

কে বলে তুপুর্নে হাতে নেই কোনো কর্ম ?
অভ্যাসে বশ রাখি—নাক-ডাকা ধর্ম !
নয়ত বা অচিরেই,
দেখা যাবে আমি নেই,
হাওয়াতে মিলোবে এই শরীর আর মর্ম !

কিশলয়ের মেলা ॥

॥ দুটি লিমেरिक ॥

নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী

১

অংকে পারদর্শী সীতারাম রায়,
করে শুনে যোগ করে দেয়ালের গায় ।
বন্ধু যে দেখে ফেলে
হাসে শুধু গালে গালে
সীতারাম মাথা ঝুঁকে—বলে হায় হায় ॥

২

এড্‌ওয়ার্ড লীয়ার লিমেरिकের রাজা
ছবি ছড়া লিখে পরে খেতো তেলে ভাজা
আজ্ঞে বাজ্ঞে মাথা মুণ্ড
শোনে বলে স্ত্রীমা কুণ্ড
আরও ভালো লিখবোই খেয়ে কড়া গাঁজা ।

— — —

শারদীয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে আহ্বান জানাই—

বিবাহে, উৎসবে, নিত্য প্রয়োজনে ও অতিথি

আপ্যায়ণে অভিজাত মিষ্টান্ন প্রস্তুত কারক

সত্যনারায়ণ মিষ্টিান্ন ভাণ্ডার

মক-বান্নাকপুর ষ্টেশনের পশ্চিম দিক,

[অতি যত্নে অর্ডার সরবরাহ করিয়া থাকি]

পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।

॥ পূজা ॥

পঙ্কজ দে মহরী

ঠাকুর নাকি এই দুনিয়ায়
 আছেন জলে স্থলে ।
 মহান, বিজ্ঞ, গুরুজনেরাও
 সে কথাই তো বলে ॥
 সেই নিয়মেই বিশ্বাস ছিল,
 জ্ঞান লভেছি যবে ।
 প্রাণ ঈপিয়া, মন ঈপিয়া
 পাইনা কেন তবে ?
 বিপদতারণ নাম আছে তার
 অভয় দেবার তরে ।
 বেছে বেছে করেন দয়া
 মুখ চেনাদের পরে ॥
 এষ্ট দুনিয়ায় স্বার্থ নিয়ে
 মানুষ জাতটাই চলে ।
 কোন দেবতা চায় না কিছুই
 কে দেবে তা বসে ॥
 পূজার কর্তৃ লব্ধ হ'লেই
 দয়ার ওজন বাড়ে ।
 কর্তৃ ছোট ? পূর্ণ মন ?
 মিলবে নাকো তারে ॥

অন্তরটাকে কঠোর করে
 মনটা করে শক্ত ।
 উপকরণ অনেক হ'লেই
 তুমি আসল ভক্ত ॥
 এমনি যদি নাইগো হবে
 সামনে পূজো আসছে ।
 সেই সময়ে বাংলা কেন
 চোখের জলে ভাসছে ?
 শিশুর কান্না মায়ের কাছে
 পূজার পোষাক চাই ।
 মা চেয়ে রয় দেবতা পানে
 কোনও উপায় কিগো নাই ?
 ঘটনাচক্রে চোখের জলে
 পাষণ যদি বা গলে ।
 নিষ্ঠুর দেবের কঠোর হৃদয়
 তিলেক নাহিকো টলে ॥
 পাষণ দেবতা কয়না কথা
 চায়না অভাগা পানে ।
 উপাচার কম অভাগা জননী
 দেবতা যে ভা জানে ॥

কিশলয়ের মেলা ॥

ছিন্ন বসন মলিন বসন
 বাংলা দেশের জন ।
 ভক্তিপূর্ণ মনটা থেকেও
 পায়না দেবের মন ॥
 ভাঁড়ার বাড়ন্ত শীর্ণ গেহ
 বাঙালী দিশে হারা ।
 ঠাকুরের দয়া মেলে না তাদের
 ভক্ত আসল যে তারা ॥
 ঠাকুর সে তো ধনীর কেনা
 দীনের নয়কো কেহ ।
 ভাঙ্গা ঘর আর শুক ভাঁড়ারে
 ভাল যায়না তাঁর দেহ ॥
 লক্ষ কঠোর জয়গান তার
 পশেনা কভুকো কানে ।
 চোর ডাকাতে বেঁধেছে তারে
 চোরাই ধনের দানে ॥

ছয়টি রিপু পুষছে যারা
 শুষছে মোদের আন-প্রাণ !
 তারাই লভে দেবের আশীষ
 তারাই পাচ্ছে দেবের দান ॥
 এক বছরের খোরাক মোদের
 উড়ায় যারা একরাতে ।
 তারাই আছে মহা স্মৃথে
 তারাই হবে দুধ-ভাতে ॥
 মোদের ঘরে ঝাড়বাতি নেই
 মাটির প্রদীপ রোজ' জ্বলে ।
 দয়া করে দেব-দেবী তাই
 মোদের ছেড়ে দূর চলে ॥
 সিংহ চিহ্ন বসবার আসন
 দেবার নেই কো মোর ঘরে ।
 কাঠের পিড়ী তাই জোঁটে না
 রুষ্ট দেবের রোষ বরে ॥
 নয়কো তাঁরা তোমার আমার
 নয়কো তাঁরা দীনের ভাই ।
 প্রচুর ওয়ালার দাস যে তারা
 কারণ, তাদের ভক্তি নাই ॥
 এই যদি হয় দেবের সজ্জা
 মানুষই কেন রুষ্ট হয় ।
 দেব-মানবে এই ছনিয়ায়
 আর কি কভু ফারাক রয় ॥

ইতিকথা

মা দুগ্গার কথা শোন

হরপ্রা

ড্যাম্ ড্যাম্ কুর্ কুর্ ঢাকের বাজি, কাইনা কানা বাজ্ছে কাঁসি
নতুন জামা, জুতো পরে ধরছে নাকো মুখে হাসি।

দুগ্গা মাকে দেখতে সবাই যাচ্ছ জানি আনন্দেতে,
জানকি তার মজার কথা ?—শোনাই শোন কানটি পেতে।

এক যে ছিল রাজা। সে আবার যে সে রাজা নয়, একেবারে
স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, হাতে তার ভীষণ-বজ্র, যা'কে মারবেন সেই হবে
কুপোকাৎ। আর এক ছিল মহিষ—সে এক বিরাট দৈত্য। শিবের
বর পেয়ে তার বৃকের পাটা বেড়ে যায়। সমস্ত জগৎ জয় করে
যত দৈত্য দানব সঙ্গে নিয়ে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ রবে স্বর্গে দিল একদিন
হানা। স্বর্গের রাজা বলেন—

‘দাঁড়া খবরদার—

এক পা কাছে আসিস যদি আর

এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার

টুকরো ক’রে দেব তোদের সেরে’

কিন্তু কে শুনে কার কথা ? দেব—অশুরে ভীষণ লড়াই বেধে
গেল। দেবতারা দৈত্য দানবের কাছে হেরে গেল। কেউ মারা
গেল, কেউবা ভয়ে দিল চম্পট। রাজা ইন্দ্র তখন দূর থেকে বজ্র
ছাড়লেন। কিন্তু এ কি ? বজ্র অশুরের কিছুই ক’রতে পারল না।
ইন্দ্র তখন ভয়ে স্বর্গ থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। হীরে, জহরৎ,
পাশা, মণি দিয়ে মোড়া পড়ে রইল তার সোনার বাড়ী। মহিষা-
শুরের তো খুব মজা ! আরামেই তার দিন কাটতে লাগল।

কিশলয়ের মেলা ॥

এদিকে ইন্দ্র চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হাজির হলেন বুড়ো
 ব্রহ্মার কাছে। কি সব পরামর্শ করে হুঁজুনে চললেন শিবের কাছে
 কৈলাসে। নন্দী, ভৃগু, তৃত প্রেত নিয়ে শিবঠাকুর ছাই মেখে বসে
 আছেন। শিব প্রথমে ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রকে দেখে হকচকিয়ে উঠলেন।
 শেষে সব শুনে তিনজনে চললেন আবার নারায়ণের কাছে গোলকে।
 নারায়ণ চোখ বুজে সব শুনলেন। তারপর যুক্তি করে সকল দেবতা
 এসে হাজির হলেন কাভ্যায়ণ মুনির আশ্রমে। ইন্দ্র একে একে
 অশুরের অভ্যাসের কথা তুলে ধরলেন। সে কথায় এক মজার
 ঘটনা ঘটল।

বিষ্ণু শুনে রেগে আগুন, শিব ব্রহ্মাও ক্রোধে জ্বলে
 সব দেবতার তেজের শিখা জমল হঠাৎ আকাশ-তলে।

তাতেই সৃষ্টি হলেন মা দুর্গা। দশদিকে তাঁর দশ হাত।
 নারায়ণ দিলেন তাঁর হাতে ভীষণ চক্র, শিব দিলেন ভয়ঙ্কর খুল। অটু
 হালিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। মা দুর্গা ছুটে চললেন স্বর্গের
 দিকে। বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ। মহিষ এক এক মায়া রূপ ধরে মায়ের
 সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। দৈত্যের সব ছলনাই শেষে বিফল হ'ল।
 মা শেষে চুলের মুঠি ধরে দৈত্যের বুকে বসিয়ে দিলেন ত্রিশূল।
 অমনি বাছাধন দৈত্য কুপোকাৎ।

লুটিয়ে প'ল অশুর রাজা, ভাঙল তাহার বড়াই
 দেবতা কাছে এলেন দেবী, ভেঙে দিয়ে তার লড়াই।

রাজা ইন্দ্র তখন তার স্বর্গ রাজ্য কিরে পেলেন। দেবতারা সবাই
 মিলে সেখানে মায়ের পূজা করলেন। এস আমরাও শিউলি, পদ্ম-
 ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে মায়ের পায়ে মন প্রাণ দিয়ে প্রণাম করি।

— — —

কিশলয়ের মেলা

ইতিহাসবন্ধ

—বাঘা যতীনের আদিকথা—

পুলকেশ দে সরকার

“বেঙ্গলী” থেকে এই সংবাদটি “অমৃতবাজার পত্রিকা” ১৯৭৮ এর ১৬ই জুন উদ্ধৃত করলেন :

বাবু যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব গেজেটিয়ার রিভিসান অফিসের একজন কর্মী। স্মরণ করা যেতে পারে, শিলিগুড়ি রেলস্টেশন প্ল্যাটফর্মে দু'জন ইউরোপীয়ান মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে তাঁকে ঘূষোঘূষি করতে হয়েছিল। কি অবস্থায়, তা ইতিপূর্বে রিপোর্ট করা হয়েছে। তাঁর প্রভু মিঃ ও. ম্যালি (O. Malley) হঠাৎ তাঁকে ডেকে পাঠান। সদয় প্রকৃতির এই সাহেব যতীন্দ্রনাথকে বললেন, তাঁর (যতীন্দ্রনাথের) চাকুরী বাঙলা সরকারের হেফাজতে দেওয়া হ'লো। কারণ জানা যায়নি। কোন অপরাধ হয়েছে কি? এ কি তারই দণ্ড? যতীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁকে শুধু এই বলা হ'লো যে, অসন্তোষের কারণ ঘটানো তো দূরের কথা, তাঁর কাজে সম্ভট হয়ে এই সেদিন তাঁর পদোন্নতির জন্ত সুপারিশও করা হয়েছে।

যতীনবাবু এর পর তাঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে হুকুমনামা নেবার জন্ত সেক্রেটারিয়েটে যান। সুস্পষ্ট আদেশের ভঙ্গিতে তাঁকে সেদিনই, অর্থাৎ ১২ই তারিখে স্টেশন ছেড়ে যেতে বলা হয়।

যতীনবাবু বললেন তিনি আজ এখানে তিন বছরের মত আছেন, এত অল্পসময়ের মধ্যে তাঁর জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে বেগ পেতে হবে। সে কথায় কর্ণপাতই করা হ'লো না। তাঁকে কলকাতা অফিসে যোগ দিতে এবং কালকের মধ্যেই অবশ্য অবশ্য স্টেশন ছেড়ে যেতে বলা হ'লো। অতএব তিনি ছেড়ে গেলেন।

লোকের সন্দেহ হচ্ছে, তিনি এখানকার ঐ দুর্ঘটনার পর থেকেই পুলিশের নজরে পড়েন। দুর্ঘটনাটা হচ্ছে সেই দুই ইউরোপীয়ানের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। ইউরোপীয়ান দু'জন এক মহিলাকে নিয়ে এমন সারি বেঁধে রাস্তায় চলছিলেন যে, পুরো রাস্তাটা ছিল তাঁদের তাঁবে; যতীনবাবু অনেক কষ্টে তাঁদের পাশ কাটিয়ে যান। এই পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কিছু চড়া মেজাজে কথা কাটাকাটি হয়, তারপর হয় ঘুষোঘুষি। এছাড়া, যতীন বাবুর আচরণ ও চরিত্রের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আর কোণ প্রমাণ আছে কিনা আমরা জানিনা— যে-সাক্ষ্য প্রমাণ বলে তাঁরা এমন আদেশ জারি করতে পারেন। কিন্তু আমরা তাঁর চরিত্র ও আচরণের যে-খবর রাখি, তা হচ্ছে আদর্শ চরিত্র, বিনম্র, বিনীত, কর্তব্য পরায়ণ ও সৎ। তাঁরই অক্লান্ত ও সোদোরপম যত্নে একটি বালকের জীবন রক্ষা পায়। ছেলেটির মারাত্মক রকমের নিউমোনিয়া হয়েছিল, কেউ দেখবার ছিল না।

আর সরকারী কতৃপক্ষ তাঁকে কেবল বহিষ্কার করেই ক্ষান্ত হন-নি, পাছে তিনি কোথাও তাঁর বিষ রেখে যান এবং আর কারও মধ্যে তা' সংক্রামিত হয় এজন্য যে-বাড়ীতে তিনি থাকতেন সেখানে এবং তাঁর বন্ধুদের বাড়ীতেও তল্লাসী হ'লো গতকাল বিকেলবেলা। একজন ইন্সপেক্টরের অধীন একদল পুলিশ; সাহায্য করেছিল এক বাড়ামী "টিকটিকি"। ইন্সপেক্টর ডঃ ড্যালি (Daly) যতীনবাবুর বাড়ীটি যখন তল্লাসী করে চলে যাচ্ছেন তখন ঐ টিকটিকি তাঁর কানে কানে কি যেন বলল, ইন্সপেক্টর ফিরে এগেল আর একটা বাড়ী তল্লাসীর জন্ত। ঐ টিকটিকিটি কৌতূহলী লোকজনকে বলছিল "একটা চুরির ব্যাপারে ঐ তল্লাসী হচ্ছে"। তল্লাসী করে কোন বোমার বড়বস্ত্র বা তেমন কিছুই উদ্ধাটিত হয়নি।

প্রসঙ্গ কথা

লিটেল ম্যাগাজিন সমস্যা। ষড়যন্ত্র

কালিদাস ভট্ট

লিটেল ম্যাগাজিনগুলোকে বেঁচে থাকতে হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তির চরম ঔদাসীন্যের উপর। তবু আজ একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সরকারী সক্রিয় প্রতিকূলতা এমন নির্মম রূপ নিয়েছে যার ফলে এদেশের লিটেল ম্যাগাজিনের মৃত্যু হবেই। অবশ্য ইতিমধ্যে আশি ভাগেরই মৃত্যু হয়েছে—কুড়ি ভাগ মুমূর্ষু।

একদিকে পুঁজিবাদ ও তার তত্ত্বাবাহকের কৃত্রিম নিউজপ্রেন্টের অভাব সরকারী করের বোঝায় কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি—অপর দিকে প্রেসমালিক সমিতির ষড়যন্ত্রে ছাপার খরচ আওতার বাইরে। তারপরে আছে বিজ্ঞাপনের ঘাটতি।

অথচ বাংলাসাহিত্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই লিটেল ম্যাগাজিন থেকেই আজ প্রকাশ করেন প্রকৃত বুদ্ধিজীবী তথা শিল্পী, কিন্তু আজ যখন সেই লিটেল ম্যাগাজিন মৃত্যুপ্রহর গুনছে তখনও প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চুপ (ভয়ে কিংবা প্রলোভনে), আর সাহিত্যের দিকপালেরা নির্বাক। অথচ একদিন তাঁরাও লিটেল ম্যাগাজিন আন্দোলনে বাংলা সাহিত্যকে বাঁধার পরিস্থিতি থেকে বের করে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে উর্বর করেছিলেন।

আর আজ সেই লিটেল ম্যাগাজিন যখন পূর্বশুরুর দায়ী পালনে উদ্যোগি; কাগজ সংকট তখন প্রচণ্ড আঘাত হানলো। তবুও সাহিত্যের লেবেল ঝাঁটা একচেটিয়া পুঁজিবাদী সংস্থাগুলো চক্চকে

কিশলয়ের মেলা

পালিশে মোড়া নতুন নতুন পত্রিকা প্রকাশে উদ্‌যোগী । অথচ কাগজ সংকটে লিটল ম্যাগাজিন বিপন্ন ।

এক স্বাধীনতা কালে (১৯৪৬) ব্রিটিশ প্রশাসকেরা প্রেসমালিক সমিতির সহায়তায় ডাণা বরচ অস্বাভাবিক বাড়িয়ে প্রগতিশীল তথা বাংলার বৈপ্লবিক চেতনায় ছুরিকাঘাত করেছিলেন—জিবীকার প্রয়োজনে বুদ্ধিজীবীরা ডিকেটিতথিলের মত বিভিন্ন নেশায় মেতে উঠেছিলেন ।

স্বাধীনতার আটশবছর পরে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যখন পূর্বপুরুষের দায়িত্ব পালনে উদ্‌যোগী, তখনই সরকারী প্রশাসনের চরম উদাসীনতার স্বযোগে পুঁজিবাদী সংস্থাগুলো কৃত্রিম কাগজ সংকটে তরুণ বাংলার বৈপ্লবিক চেতনায় ছুরিকাঘাত করল ।

তফাৎ এইটুকুই যে আজ আমরা স্বশাসিত হয়েও সেট একটু বড়বড়ের শিকার হয়েছি এবং হচ্ছি ।

বাজারের সেরা মিষ্টি যদি চান :—

তবে জানবেন—

শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

নব বারাকপুর বাজার, নব বারাকপুর ।

শ্রোঃ—ভারাপদ ঘোষ

অতীতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে—এই সত্যকে তুলে ধরতে ভবিষ্যতে বর্তমান হয় ছবির মাঝে—ছবির অর্থই ক্যামেরার চোখ । সেই ক্যামেরার চাতুরীই হল :—

বিন্দু আর্ট ষ্টুডিও

মেডানী স্কয়ার রোড, নব বারাকপুর ।



সজ্জিত চৌধুরী

জ্যোৎস্না নীলাক্ত হয় কেন ?

চাঁদের আলোতে সব রঙই প্রায় সমান ভাবে আছে। কিন্তু আমাদের চোখ সব রঙকে সমানভাবে দেখতে পায় না। খুব উজ্জ্বল রঙ চ'লে সেই রঙটি আমরা ভালভাবে দেখতে পাই। যেমন সূর্যের আলোর কথাই ধরা যাক। সূর্যের আলোর মধ্যে হলুদ আর সবুজ, এই দু'টো রঙ-এর মাঝামাঝি একটা রঙ আমাদের চোখে বেশী অল্পকৃত হয়। আর যদি আলো খুব মৃদু হয়, তবে সব রঙ-এর চেয়ে নীল রঙটাই আমরা বেশী দেখতে পাই।

সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিকলিত হয়ে যখন পৃথিবীতে আসে তখন তাকেই আমরা জ্যোৎস্না বলি। এতটা ঘূরে যখন আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তখন নানা কারণে স্বাভাবিকভাবেই তা অত্যন্ত মৃদু হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা জানি যে আলো মৃদু হলে, নীল রঙটাকেই আমাদের চোখ বেশী দেখতে পায়। আবার যখন সাতরঙের সূর্য্যকিরণ চাঁদের উপর এসে পড়ে তখন চাঁদ সেই আলোর কিছুটা অংশ শোষণ করে নেয় এবং বাকী অংশ চাঁদ নিজেই প্রতিফলিত করে দেয়। এই প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যে নীল রঙ-এর প্রাধান্য থাকে। এই রশ্মিগুলি তখন আমাদের চোখে নীলাভ দেখায়। জ্যোৎস্না নীলাক্ত হওয়ার এও একটা কারণ।

P29398

কিশোরের মেলা ॥

চুল পাকলে সাদা দেখায় কেন ?

আমরা জানি, কোনো কিছুর ওপর সূর্যের আলো পড়ে যদি তার সবটাই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তবেই সেটাই জিনিষটা সাদা দেখায়। জলে সাবান ধুলে, কাঁপা কাঠির মুখে সেটাই জল নিয়ে বড় বড় সাদা রঙ-এর বৃদ্ধ তৈরী করা যায়। বৃদ্ধদের পালিশ করা দেয়াল থেকে সব আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে বলে বৃদ্ধ সাদা দেখায়। অবশ্য বৃদ্ধদের দেয়াল খুব পাতলা হ'লে নানান রঙ দেখতে পাওয়া যায়—সে অবশ্য অল্প কথা। যদিও সমুদ্রের জল নীল দেখায় তবু তার কেনা সাদা দেখায়, তার কারণ, তখন জল দিয়ে হাজার হাজার ছোট ছোট বৃদ্ধ তৈরী হয়। এটাই বৃদ্ধগুলি চক্চকে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আলোর প্রায় সবটাই আমাদের কাঁতে ফিরে আসে, তাই কেনা সাদা দেখায়।

রজনীগন্ধা, জুঁই এই ফুলগুলি কেমন সুন্দর সাদা সাদা পাপড়ি দিয়ে তৈরী। এদের পাপড়িতে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃদ্ধদের মতো পালিশ করা ঘর তৈরী আছে (খালি চোখে দেখা যায় না)। যদি পাপড়িগুলো চেপে দিয়ে এটাই ঘরগুলোর দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা যায়, তবে তাদের আলো ফিরিয়ে দেবার শক্তি কমে যায়। সেই অল্পই রজনীগন্ধার পাপড়ি চেপে ধরলে তা বিবর্ণ হয়ে পড়ে।

এইবারে আমরা চুলের কথায় ফিরে আসি। চুল যখন সাদা হওয়ার উপক্রম করে, তখন তার মধ্যেও এমন ছোট ছোট বাতাস ভরা কোষ (Cell) তৈরী হ'তে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই cell গুলির জায়গায় চুলের আসল যে রঙ তাই দেখা যায় কিন্তু সাদা হবার সময় এই রঞ্জক পদার্থের (Pigment) কণাগুলি সেই ছোট ছোট গ্যাস-ভরা কোষগুলো দিয়ে ক্রমশঃ অপসারিত হতে থাকে। এটাই কোষগুলোর দেয়ালে আলোর সবটাই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসাতে চুল সাদা দেখায়।

কিনলয়ের মেলা

অর্থাৎ মাগুয়ের চুল যখন সাদা হ'তে আরম্ভ হয়, তখন তার অর্থ প্রথম অবস্থায় যে চুল তার রক্তক পদার্থ নিজের ভিতর নিয়ে উঠত, এখন সে আর তা পাচ্ছে না। তার বদলে গগস ভরা কোষ নিয়ে তাকে উঠে আসতে হচ্ছে।

কখনও কখনও দেখা যায়, কারও এক রাত্রির মধ্যে মাথায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে রক্তক পদার্থ সবটা নষ্ট হ'তে পারে না, রক্তক পদার্থগুলির উপর এই গগস ভরা cell গুলোর একটা আবরণ পড়ে। ফলে চুল সাদা দেখায়।



স্বামী বিবেকানন্দ

রেবা চক্রবর্তী

ভারত ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। পরাধীন দেশ, পরাস্থকরনে মোহাজ্জর আত্মবিশ্বস্ত জাতি, প্রাণহীন অভ্যন্তর সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ সমাজ। এই গাড় তমসাবৃত ভারত—ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের অনিত তেজোদীপ্তিতে বিবেকানন্দের মহা প্রকাশ।

১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী কলকাতা সিমুলিয়ায় বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙালীর ঘরে ঘরে তখন পোষ পার্বণের

কিশলয়ের খেলা ॥

আনন্দোৎসব। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের এটর্নী ছিলেন, মাতা ধর্মপ্রাণা ভুবনেশ্বরী দেবী। নবজাত শিশুর নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর, সংক্ষিপ্তভাবে 'বিলে' বলে পরিচিত ছিলেন গৃহে। পরে অল্প প্রাশনের সময় তাঁর নামকরণ হয় নরেন্দ্রনাথ। ছোটবেলায় নরেন্দ্রনাথ খুব ছরস্তু ছিলেন। একবার হয়েছে কি, সাজ উতরে গেছে তবু দেখা নেই এক রস্তির ছেলেটার। শ-খানেক বছর আগেকার কলকাতা সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চলে চোর ডাকাত আর ছেলে ধরাদের উপজব। চিন্তার কথা, বিলের বাপ—মা অনেক খুঁজে মাঝরাতে তাকে পেলেন বাড়ীর নির্জন কলাবাগানে। বিলে শুনেছিলো হুমুমান অমর আর কলাগাছেই নাকি তার বাসা; তাই সে সেখানে বসেছিল হুমুমানের দেখা পাবার আশায়। বড় হয়ে উঠল বিলে, এখন আর সে হুমুমানকে খোঁজে না—খোঁজে ভগবানকে। মেট্রোপলিটন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জেনারেল এসেম্বলী ইন্সটিটিউশন থেকে এক. এ ও বি. এ পাশ করেন। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, ছিল খেলাধুলায় পারদর্শিতা, বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। তাঁর প্রখর স্বরণশক্তি ছিল। অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি নরেন্দ্রের দার্শনিক মত-বিশেষের বিশ্লেষণে মন্তব্য করেছিলেন। "He is an Excellent philosophical student. In all the German and English Universities there is not one student so brilliant as he is" নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অভাব অনটন দেখা দিল। তখন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন নরেন্দ্রনাথ, পরমহংসদেব তাকে দেখে বলে উঠলেন; বড্ড অভাব, না? তা মন্দিরে কালীমায়ের কাছে যা, তাঁর কাছে যা চাইবি, তাই পাবি, বিলে কাছে গিয়ে চাইলে ভক্তি, বিশ্বাস আর বল, কিছুতেই টাকা পয়সা চাইতে পারল না। পরমহংসদেব তাঁকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিয়ে নাম রাখেন স্বামী বিবেকানন্দ আর বলে গান, নিজের মুক্তি খুঁজিস্নি, পরের উপকার করিস্ন।

১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর বিবেকানন্দ সংঘবদ্ধ করলেন ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দকে। সেবাস্বার্থের মধ্য দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে তোলবার সংকল্পে রামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দ বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ সালে “রামকৃষ্ণ মিশন” ও ১৮৯৯ সালে “স্বদেশী মঠ” গড়ে তোলেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকা শিকাগোতে ব্রহ্মসম্মেলনে ভারতের সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুদ্ধিয়ে দিলেন হিন্দুধর্মের যথার্থতা। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে নানাস্থানে বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের বহুগুণী ব্যক্তি ভক্তিরেবির বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) তাঁর একজন যোগ্য শিষ্যা। দেখতে দেখতে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ, চিঠিপত্র এবং বক্তৃতা মালার মধ্য দিয়ে সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পরিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর লেখা ইংরাজী কবিতা ‘Kali the Mother’ এর মৃত্যুরূপা মাতা প্রসন্ন হ’লেই সকলের কল্যাণ। হিন্দুধর্মের মর্মবাণী প্রচারের কার্যে তিনি দেহমন উৎসর্গ করেছিলেন ১৯০২ সালে ৪ঠা জুলাই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে যোগীর বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে অগম্যতা তাঁর কোলে টেনে নিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্মের মূল বাণী “জীবের সেবাই ঈশ্বর সেবা।”

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীব প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

ধর্মভেদ, জাতিভেদ বিলুপ্ত করে মহান ঐক্যবন্ধ বলিষ্ঠ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন

“হে ভারত ভুলিও না—নীচ জাতি মুর্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি,
মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।”

তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত উপনিষদের বলিষ্ঠ বাণী “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য
বরণ নিবোধত” চিরদিন আমাদের অভয়দান করবে।

অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা অভ্যন্তরীণ সুস্থকারে নৃত্য ও সঙ্গীত
শিক্ষকবৈজ্ঞানিক হয়—

ঃঃ কিশলয় গীতবিতান ::

সঙ্গীত বিভাগ—

শিক্ষক—শ্যামল বসু

ভর্তি ফি—৫ টাকা,

মাহিনা—৮ টাকা

নৃত্য বিভাগ—

শিক্ষক—মন্টে মরকার ও শীপ্রা মরকার
মাহিনা

ভর্তি ফি—৩ টাকা

ক ব বিভাগ—০ টাকা

১ম বর্ষ—৪ টাকা,

২য় বর্ষ—৪ টাকা,

৩য় বর্ষ—৭ টাকা,

৪র্থ বর্ষ—৭ টাকা,

৫ম বর্ষ—৮ টাকা,

৬ষ্ঠ বর্ষ—১০ টাকা

পরিচালনায়—কিশলয় সব পেন্সেজির আসন্ন

সব-বারাকপুর, ২৪ পরগণা

বিঃ দ্রঃ—সঙ্গীত ও নৃত্যে প্রত্যেকের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শারদীয়া



আ

ম

রা



ডাই
বোনেরা



১০৮১

বর্ণবিভা

“এবারের পূজা”

চঞ্চল চক্রবর্তী

এবার আমরা পূজার সময়
মামা বাড়ী যাব,
—বাড়ীর মজার বাপার
মণ্ডা মিঠাি পাব
নতুন নতুন জামা পড়ে
চুটপো দ্যে
তে সামান্য বাজে
বাজিকে মদর শুে
পুরোত মলাই ঘণ্টা বাজায়
হচ্ছে যে কোলাহল
আলোর মাঝে তারিয়ে গিয়ে
খেলছে শিশুর দল
ঢাকের তালে বাজছে কাশি
খশীর সীমা নাই,
মামা বাড়ী যাচ্ছি পূজায়
রাগ কর না ভাই ।



কবিতা

“আমার কবিতা”

অর্ণা বসু

ছোটদের কবিতা,

কি যে লিখি তাবি তা ;

ভেবে ভেবে দিশেহারা,

মনে তবু নেই সাড়া

খুঁজি কোথা হয় মিল,

বেগে দোরে দেই খিল

শেষে খাটে শুয়ে পড়ি,

ঘুম আসে চোখ ভরি ।

কে যেন শিয়রে এসে,

বলে যায় হেসে হেসে

কি হয়েছে বল দেখি,

চেহারা করেছে একি ।

কবিতা লিখতে চাই,

আবার কলম নাও

মনেতে আসবে যা,

কবিতা হবেই তা

ছড়া

“দুধভাত দেবো”

জয়দেব চক্রবর্তী

রাগ করো না সোনামণি দুধভাত দেবো,

দুধভাত না থাকলে রেশনের চাল দেবো ।

রেশনের চাল পচা হ'লে ক্ষুদ্রকুড়ো দেবো,

ক্ষুদ্রকুড়ো ইঁদুরে খেলে ঘাসের বীচি দেবো ।

রাগ করো না দাছগো,

ঘাসের বীজ খেয়েছো ।

যখন খাবে, কোথায় যাবে তোমার অন্ত রাগ ?

বলবে না আর, যা শত্রুর ! সামনে থেকে ভাগ ।

তখন তোমার এই গালেতে আমিই চুমু দেবো ।

রাগ করোনা দাছমণি দুধভাত দেবো ।

কিশলয়ের ঘেলা



: বকুর জন্ম :

সিতাংশু বিশ্বাস

বিকলে দেখা গেল মিটুকে পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজ খোঁজ, কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে পেল না। মিটুর মা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল আজ মিটুকে দেখেচিস? আমি বললাম না তো। মিটুর মার চোখের জল গড়িয়ে পড়তে আমি লক্ষ্য করলাম। তিনি সেখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, “মিটুকে দেখলে আমাকে খবর দিও।” আমি তখন বললাম আচ্ছা। আমার প্রিয়তম বন্ধু, না খুঁজে পারলাম না। তাই না পেয়েই মায়ের নাত শুল না গিয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। মা বললেন সাবধানে চলাফেরা করিস বাবা। আমি বললাম আচ্ছা না, আমি সেরকম বোকা ছেলে নই। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তায় মিটুর কথা ভাবতে ভাবতে চৌরঙ্গীর মোড় ধরে এগিয়ে চলেছি। আস্তে আস্তে একটা খালি জায়গায় এসে পড়লাম। মিটুর মা যখন বলেছেন তখন পাওয়া দাওয়ার কথা মনে নেই, তাকে খুঁজতে খুঁজতে যেখানে এলাম দেখি একটা পোড়ো বাড়ী। আমার বকের ভিতর ঠর ঠর করতে লাগল। হঠাৎ দেখলাম একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তাই একটা গাছের আড়ালে গেলাম। লোকটা আমার পাশ দিয়ে গিয়ে, কোথা থেকে কতকগুলো ছেলেকে নিয়ে এল, তার প্রথমটে দেখতে পেলাম মিটুকে। আমি মনে মনে ভাবলাম কি করা যায়। আমি পাখী মারবার জন্ত সবসময় আমার বাগে একটা গুলতি রাখতাম। তাই আমি একটা মগডালে উঠে কতকগুলি ডালপালার সঙ্গে মিশে সেট লোকটার মাথা তাক করে মারলাম গুলতির গুলি। তখন লোকটা ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, কেরে এটখানে। আমি দ্বিতীয়বার

তাক করে মারতেই সে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তখন আমি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এক এক করে সবার বাধন মুক্ত করলাম এবং সবাইকে নিয়ে দৌড় দিলাম। আমরা পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি (লোকটা দেখছে—) আমরা সবাই দৌড়ে পালাচ্ছি। আমরা তখন লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেলাম। তখন সে বোধায় উদাস হয়ে সেই পোড়ো বাড়ীটায় ফিরে গেল। আমি মিটুকে আমাদের ছাদে এনে আগে সব শুনলাম। সে বলল, আমি যখন কাল ফুলে যাঈ তখন আমাকে একটি লোক একটা সুন্দর ফুল দেখিয়ে বলল যে চলো এরকম অনেক ফুল তোমাকে দেব (মিটু ফুল পছন্দ করতো)। এই বলে লোকটা আমাকে সেই পোড়ো বাড়ীটায় নিয়ে গেল। আমি যখন পোড়ো বাড়ীটার কাছে গেলাম তখন আমি বললাম যে আমি বাড়ী যাঈ, কাল আসব, তখন লোকটা আমার দিকে ভোরা দেখিয়ে বলল “যেতেই হবে এখানে।” বাড়ীটায় গিয়ে দেখিলাম যে অনেক ছেলে বন্দী হয়ে আছে। তখন আমি বৃক্ষে পারলাম এটাই ব্যবসা ওদের। তারা আমার দিকে হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাকে ওরা কাল নিয়ে যাবে রোমে। আজ যদি আমাকে উদ্ধার না করতিস তাহলে আমাকে কেউ খুঁজে পেত না। তুই আমার প্রিয় বন্ধু, তুই আমাকে না বাচালে আমাকে ওরা রোমে পাঠিয়ে দিত। আমি আর কোন দিন আমার নাবা, মা, তুই, মাসীমা কাউকেই দেখতে পেতাম না। এই বলতে বলতে ও কঁদে ফেলল। তারপর আমি ওর বাবা ও মাকে খবর দিলাম। ওর মা ও বাবা সবাই ছুটে এল। সব কথা শুনে আমাকে বললেন দেশে এইরকম ছেলে কয়টা আছে। তখন ওর নাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ওদের বাড়িতে এবং পেট পুরে আমাকে মিষ্টি খাওয়ালেন। আরো বললেন তুমি না থাকলে আমার মিটুকে কেউ বাচাতে পারত না। আমি তখন লক্ষ্য করলাম, সবার চোখে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে অশ্রু হৃৎকের নয়, আনন্দের।

ছড়া

“মজার কথা”

কানন দাস

চাল নেই তলোয়ার নেই
আমি হ'লাম সর্গার,
পান খাটনা চুন খাইনা
ভক্ত তবু জর্দার ।
জমি নেই প্রজা নেই
আমি রাজা পড়দাব,
টাক মাথায় চুল নেই
টেরি আছে পড়দাব
ঘব নেই কুমার নেই
কাপড় চাউ পড়দাব,
খাগা নেই মাথা নেই,
পত্নী ত'লে।

“বাজনা”

সুপ্রা দাস

সজনা গাছে সজনা দোলে—বাজনা বাজায় বংশীলাল,
আগভালেতে বন টিয়েটা—পিসু বাজিয়ে দিচ্ছে তাল
জমির মালিক রাজেন খুঁড়ে—গাজন তলায় বাস করে,
দৌড়ে এলো বাজনা নিতে—এক মুঠিতে বাঁশ ধরে ।
বাজনায় যে পড়লো বাধা—চটলো বিষম বন-টিয়ে,
ঠুকরে দিলে খুড়োর টাক—রক্ত ঝরে কিনকি দিয়ে ।

কিশলয়ের মেলা ॥ ৩২

কবিতা

“এশিয়া”

গৌতম কুমার দত্ত

যুদ্ধের মহাবহি ধুমায়িত দিক চক্রবালে,
দানবীয় নগ্নরূপ দেখি এশিয়ার ভালে ।
শমনের উদ্ভাসরোষে, মাড়ুকার প্রশস্ত বন্ধ—
উৎপাণ্ডের মত হল নিঃশেষ—
অজস্র উজ্জল জ্যোতিষ্ক ।
তিন্দ্রকূট দানবের মতা বিচরন,
কুরধার, নিবদন্ত উজাত দংশন ।
চির চিহ্ন রেখে গেল এশিয়ার ঐতিহাসে,
ঠেলে ওদের এমনি করেই
চলুক শোণিত প্রবাহ
নেমে যাউ নিলীধ নিজার নীড়ে ।
অত্যাচার আর বিভীষিকায় পথ বোধ কবে—
দাড়ায় ওরা শক্তির অহমিকায় ।
কিন্তু ।
জ্বলে ওঠে বিশ্ববিবেক সভা অগ্নে অরুণ আলোয়
তখনই ওদের চাবুক স্তব্ধ, মুকুট লুটায় ধলায় ।
সাম্রাজ্যবাদের দস্ত দণ্ড করে, পথ বোধ করা—
দৈত্যগুলোকে হৃদয়ের পুঞ্জিকৃত বিক্ষোভ দিয়ে—
জীবন্ত পোড়ায় ।



“বরষা”

স্বাতি বসু

বন্ বন্ শন্ শন্
 এট আসে বরষণ ।
 মাঠ ঘাট থৈ থৈ,
 ঠাস করে চৈ চৈ ।
 কাঁদা করে পাচ্ পাচ্,
 রে মাজ মাজ ।



— সূর্যাস্ত

সবতোষ বিশ্বাস

সেদিন একজন ভিখারী এসেছিল বাড়িতে । শীর্ণ দেহ, তাট
 নিজের দেহের ভার সে একটি বইতে পারছে না সে একটি লাঠি
 সাহায্য নিয়েছে । যদিও বা তার বার্ষিকো পৌজাতে এখনো চার,
 পাঁচ বছর লাগবে । তবুও তাকে একজন নকল বড়রের বুদ্ধের সঙ্গে
 তুলনা করা যায় । সেদিন সে ফাঁদ কণ্ঠে তার ছরবস্থা সম্বন্ধে অনেক
 কথা বলে গেল । তার জীবনের কয়েকটি অত্যন্ত মহাত্মিক ঘটনা
 বলে গেল সজল নেত্র ।

বিপ্লবের বেল।

ভিখারীটির পূর্বের ঘটনাগুলি অত্যন্ত মর্মান্তিক—একসময় সে একটি রুটির কারখানায় কাজ করত। কিন্তু কোন একসময় দেশে যথোপযুক্ত ময়দা সরবরাহ না হওয়ায় এবং কারখানার প্রচুর অর্থের ঘাটতি হওয়ায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়, এবং ক্রমে তাকে কুলিগিরির পথ বেছে নিয়ে সংসার চালাতে হয়। তার সংসারে ছিল তার স্ত্রী এবং পাঁচ বছরের একটি সন্তান। কিন্তু দিন দিন চাল, ডাল, তেল তরিতরকারী ইত্যাদি সমস্ত কিছুর বাজার দর হ্রাস করে বাড়তে থাকে, এমতাবস্থায় সোনার দেশের বৃক্কে মগন্তুর দেখা দেয়। চারিদিকে চাচাকার ধ্বনি ভেসে উঠতে থাকে। সেট সময় ভিখারীটির কুলিগিরি পথের আয় ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে এল। এমন দুবিসত দিনে তার পরিবারের অনৃষ্টে জুটত কতকগুলি মাঠের নানা প্রকার সাকসজি খার জ্বলা গাছ সিদ্ধ।

কিছুদিন পরে সবথেকে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে তার জীবনে—

তার স্ত্রী আর সন্তানের একসঙ্গে কলেরা হয় এবং দুজনের দেহ একসঙ্গে একই চিতায় দাউ দাউ করে জলে ওঠে। জীবনের এই কঠিন দুঃস্বাদ মধো দাঁড়িয়ে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস, একটা বাক্য (সবশেষ) ছাড়া এই অভাগার এককোটা চোখের জলও এটী শুষ্ক দেশের মাটিটিকে নরম করতে পারেনি। এমনি কঠোর নির্মম এটি ভিখারীটি। এখনো শীর্ণদেহে জীবনটাকে অম্বাহত রেখেছে। বর্তমানে তাকে দেখতে অনেকটা শিল্পীর তুলিতে ঐক্য কঙ্কাল স্বরূপ।

তাকে দিতে গেলাম একমুঠো চাল আর পাঁচটা পয়সা। কিন্তু সে তা ফিরিয়ে দিল। বললে,—“বাবা! ঘরেরত আর হাড়ি নেই যে চাল দিয়ে ভাত রাখব। আর ৫ পয়সা দিয়েও আর পেট ভরবে না, বরং বাবা! তুমি ভাত থাকেত দাও, না হয় তুমি রুটি আজকের দিনটার মত সেয়ে বাঁচি। তিনদিন ধরে কিছু জোটেনি।” (দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের সঙ্গে আবার বলতে আরম্ভ করল।) “দিনত প্রায় ফুরিয়ে
এল আর বেশীদিন নেই। পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যাবো কোন
অজ্ঞানার দেশে।”

লোকটি কথাগুলি বলে গেল খুব গভীর কণ্ঠে। লোকটিকে দেখলে
মনে হয় না যে সে কোন মিথ্যা বলছে। প্রকৃতই সে কোনো
মিথ্যা কথা বলেনি, প্রমাণ পেলাম তার খাওয়া দেখে। ভাতের
খালাটিকে সে বা হাত দিয়ে ধরে ডান হাতে অতি ক্রমত মাটিতে পড়া
তৃণ একটা ভাত সহ সমস্ত ভাত খেয়ে নিল। মনে হল মৃত্যুর সাথে
পাঞ্জা লড়াই করার খানিক আশা তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। খাওয়া
শেষে লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসি ছেঁসে বললে—
“বাবা! বেঁচে থাকো আমার মত ছুরবস্থা যেন আর কারো না হয়।”

কথাগুলি বলতে বলতে সে সামনের পাথে মৃদু এগিয়ে গেল।
চামি তার চলার পাথর দিকে আকৃষ্ট ছলাম।

কিছুদিন পর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, পৃথিবী থেকে
ভিখারীটি মুক্তি পেয়েছে। হয়ত এমনভাবে হাজার হাজার লোক
পৃথিবী থেকে প্রতিদিন অবসর গ্রহণ করেছে, করছে এবং করবে।
কে তাঁর হিসাব রাখে

ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাকাশে রক্তিম



ছড়া

“ছন্নছাড়া”

নির্মল কুমার সরকার

পাত্তর বাতুর চালতা বাতুর

রাম ঠাদারে

বড়ো বাতুরের বিয়ে,

তুট মাচ্চিস কোথা বে ?

নাচ : ৩ তবে গাট : ৩ তবে,

মাচ্চি আমি মামা বাড়ী ।

ঠাট :

তুট বাক্স : তার পকেট ভাবী ।

দাঙ মানে বধমানে

বড় মজা হবে,

বধমানেব মিতিদানা

মুখে জমে হবে

“কেমন হয়”

পদ্মা সিনহা

তুট তুণ্ডে পাঁচ

খানড়া গাছে আম

ডাঙায় চলে মাড়

তুট মুখে রাম নাম

এ সব সত্যি নয় ।

এ সব সত্যি নয় ।

কিন্তু, হ'লে কেমন হয় ?

কিন্তু, হ'লে কেমন হয় ।

শিক্ষকেরা পড়ে,

রাজা কাটেন হাস,

ভাত পড়া ধরে,

সাত দিনতেই মাস,

এসব সত্যি নয়

এ সব সত্যি নয় ।

কিন্তু, হ'লে কেমন হয় ?

কিন্তু হ'লে কেমন হয় ?

কিশলয়ের ঘেলা ॥ ৩৭

কিশলয় সব পেয়েছির আসর অভিভাবকেরা নজর দিন।

১। আসরে ভিত্তি চটনার জন্ম ৮৫ পয়সা এবং পত্রিকা ২০
মোট ২ টাকা ৮৫ পয়সা।

২। মাঠ আরম্ভের সময় :— শীতকাল, বিকাল ৪:৩০ ও গ্রীষ্মকাল
বিকাল ৫টা, মাঠ আরম্ভ চটনার ১০ মিঃ পর পর্যন্ত মাঠে প্রবেশ-
দিকার দেওয়া হয়।

৩। পর পর তিন দিন মাঠে অনুপস্থিত থাকিলে অভিভাবকের
উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া চিঠি দিবে চটনে, নতুবা মাঠে প্রবেশদিকার
দেওয়া হয় না।

প্রতিমাসে ৮ টাকা

মাঠে জন্ম দিবে চটনে

আসরের ডেস বাসাতামূলক ভাবে বৈধনী করিতে

মডার্ন ডেকরেটর্স

৩৬ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

এ ডর সি. বাবাজী ষ্ট্রট।

কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫৪২
৫৫-৬৫৬৫

উত্তরণ

মুক্তি কুমার বসু

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নিজেকেই প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষের প্রতি মানুষের ছায় বিচার, স্বস্থ-সবল, সুন্দর ও সাবলীল জীবন-যাত্রার প্রতিশ্রুতিতে সামগ্রিক জীবনের প্রয়াস। কিন্তু আজকের দিনের এই প্রয়াস সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি এক অনিশ্চয়তার অমানিশার অঙ্ককারে এসে পড়েছে। এই অমানিশার অঙ্ককারকে অস্বীকার করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাই চাই—

“এই অবস্থার প্রতিকার, চাই উত্তরণ। কিশলয়ের কর্মী পরিষদের কাছে ও যুব সমাজের কাছে আমার আকুল আবেদন সম্মুখ-সমরে উন্মুক্ত তরবারীর মুখে আত্মবিসর্জন যদি বীরত্বের পরিচায়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অত্যাচারীর অত্যাচার সহিয়া সহিয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া সুদীর্ঘ কালের প্রযত্নে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত আন্তে আন্তে অগ্রসর হইয়া যাইবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও বীরত্বেরই সূচক, শৌর্য্যেরই উপচায়ক।”

“কিশলয় সব-পেয়েছির আসর” শুচি মনের শুদ্ধ সেবা প্রতিষ্ঠান। পল্লীবাসী অভিভাবকেরা তাঁদের সম্মানদের এখানে পাঠিয়েছেন “শিব গড়বার” ভিত্তি মজবুত করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। মনে রাখতে হবে, “সেবার ছোট বড় নাই, অতি ক্ষুদ্র একটি সেবাও উৎকর্ষগুণে অতি মহৎ, অতি বৃহৎ, অতীব অসাধারণ কৌলীল্য ও মর্যাদা অর্জন করতে পারে। শুচি মনের শুদ্ধ সেবা হীরক খণ্ডের ছায় দ্রুশূল্য।”

কিশলয়ের বেলা

কুজ কুজ বীজের মতো মহীকুহের সম্ভাবনা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য, দেশব্যাপি সোনার কাঠি ভাই-বোনদের মধ্যে আগামী দিনের বেশ-নাশক, মনোবি ও কর্মবান্ধবদের বোজা লুটিয়ে আছে। আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, সত্য ও সুন্দরকে কেন্দ্র করে সোনারকাঠি ভাইবোনদের উদারনীতিবোধ ও উচ্চাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের অস্বনিহিত লুকানো প্রতিভার বিকাশ সাধনে সহায়তা করতে হবে। প্রতিভার দীপ্তি, শুভবোধ, সৌন্দর্য্য প্রীতি ও আত্মমর্য্যাদার জীবন ধারণের বিকাশ সাধনে বিশ্বাসী করতে হ'লে চাই কর্মী পরিষদের মধ্যে সম্প্রতি। নিজেদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হ'লে মিত্রতার প্রসার সহজ হবে, সাবলীল হবে। কর্মীবৃন্দের প্রত্যেককে হ'তে হ'বে সুন্দর। যে সুন্দর, সে-ই সকলের স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির, ভালবাসার, আশ্রয়, বিশ্বাসের এবং বিশ্বাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। কর্মে ও বাক্যে ধ্যানে ও ধারণায়, চিন্তায় ও কল্পনায়, দেহে ও মনে এবং অমুশীলনে হ'তে হবে সুন্দর হ'তে হ'বে সংস্কৃত সুন্দর। নিজেরা সুন্দর হ'লে প্রতিটি সোনার কাঠিও হবে সুন্দর। এইভাবে আগামী দিনের সুপ্ত নায়কদের ভিত্তিমূল সৌন্দর্য্যের মহিমায় মণ্ডিত করতে সমর্থ হলে ভবিষ্যতে মর্ত্ত্তুমি দেবলোকে পরিণত হবে — যেখানে, মানুষে মানুষে ঘটবে আত্মিকযোগ, যেখানে, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ মূর্ত্ত্ত হয়ে উঠবে। সত্যের মধ্যে মানুষের জাগরণ সম্পূর্ণ হবে। সেই নির্মল আনন্দকে সমস্ত স্তময় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করবে পল্লীবাসী তথা দেশবাসী।

॥ ভুল সংশোধন ॥

গত সংখ্যায় (২৩/৪) অভিযুক্তের দর্পণে সাক্ষাৎকার ১৯৪৮ সালের স্থলে ১৯৪৫ এবং মুরারীমোহন দাসের স্থলে বিপিন পাল ও সুরেন ব্যানার্জী পড়তে হবে।

—অভিযুক্ত



রাণাঘাটের মাল /

বিরূপাক্ষ

ঘটনাটি ঘটলো! বড় বাজার অঞ্চলের একটি চলতি বাসে—
ঠিক আমার চোখের সামনেই।

ভীড় ছিল মোটামুটি, অনেক দাঁড়িয়ে—আমি একটা সীটে বসে
আছি। হঠাৎ দেখি, একটি যাত্রীর হুটি আঙ্গুল ঠিক চিম্‌টের মত
তারই পাশে-দাঁড়ানো আর একটি সহযাত্রীর পকেটে বেমানাম ঢুকে
গেল আর বেরিয়ে এল, তার অজ্ঞাতসারে এক বাঙালি নেটি।

আমি তো তাক্‌ব!

চোঁচাবো, না জাপটে ধরবো, না ছুরি খেয়ে কাবার হয়ে যাব
ঈতাদি ভাবতে ভাবতে দেখলুম লোকটি চকিতের মধ্যে বাসের শেষ
পাদানিতে পৌঁছে গেছে। আমি তার চোখের দিকে চেয়ে। সেও
আমাকে দেখছিল, বুঝেছিল যে এঁর কাছে কীসিটা ফাঁস হয়ে গেছে—
কিন্তু বোধ হয় ভাবছিল আমিও গাঁটকাটা, তাই সমব্যবসায়ীর প্রতি
সহান, ভূতি বশতঃ কিছু বলছি না, আর নয়—পাকা পুলিশের লোক—
তাকে চিনে রাখছি। সময় বুঝে কোন সময় কোপ মারব, ভাগও
নেব। বোধ হয় এই রকম কিছু ভেবে, লোকটি বাস স্টপের কাছে
একটু গতিবেগ মন্দ্রর হতেই, আমার দিকে একটি আঁখি টিপে হাসতে
হাসতে নেমে একটা গলির মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

মাস চারেক পরের কথা। ভবানীপুর দিয়ে চলেছি—হঠাৎ
একটি লোক এসে আমায় নমস্কার করে বলে উঠল, খুব ভাগ্যি ভাল
স্যার। আপনার দেখা পেয়েগেছি, এই নিম্ন, একটা কলম।

লোকটি কলমটা আমার হাতের মধ্যে ধুঁজে দিল ।
হ'ল, খুব দামী কলম ।

আমি একটু খত মত খেয়ে গিয়েছিলুম গোড়ায়, তারপর
অসম্মতি জানিয়ে বললুম, না, না কলম টলম আমার দরকার নেই ।

লোকটি তখন জোর গলায় বলে উঠল, এটার জেঞ্ছ আপনাকে
দাম দিতে হবে না স্তার । ওটা আমি আপনাকে প্রেজেন্ট করছি ।
সবিস্ময়ে আমি তার দিকে চেয়ে বলে উঠলুম, তার মানে !

সে তখন হেসে বলে উঠল, ওটা স্তার আপনাকে না দিলে আমি
নেমকহারামী করব । সেদিন বড় বাজারে বেশ মোটা মাল যখন
গন্ত করলুম, তখন আপনি দেখে ফেলেও টেচালেন না দেখে, আপনার
ওপর মাইরী বলছি ভারি ভক্তি হল । তারপর আপনাকে যে কত
রাস্তায় ধুঁজেছি, কী বলব । কিন্তু কোথাও পাত্তা পাইনি—আজ
যখন দেখা হয়ে গেছে, তখন এটা নিতেই হবে । খুব দামী পেন্
স্তার । খুব রইন্স আদমির কাছ থেকে মারা । নিন্ রেখে দিন ।

কিন্তু আমি—বিত্রত ভাবে প্রতিবাদের চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম
সে বাধা দিয়ে বলে উঠল, না স্তার, নিতেই হবে । আমি গাঁটকাটা
হ'তে পারি, কিন্তু ধর্ম বলে একটা জিনিষ আছে । ওটা নিতেই
হ'বে ।

আমার তো বুক কাঁপছে । ইতিমধ্যে সে কলমটা জোর করে
পকেটের মধ্যে ফেলেই তড়াক করে চকিতে একটা বাসের মধ্য
উঠে পড়ল । যাবার আগে শুধু আমায় অভয় দিয়ে বলে গেল,
কিছু ভাববেন না স্তার, কোন ভয় নেই, ওটা এদিককার নয়—
রাণাবাটের মাল ।

— — —

ব্যাঙের ডাক /

কাশীনাথ পাথ

ব্যাঙ গ্যাঙের গ্যাঙের ডাকে কেন ? বর্ষাকালে তো আমরা প্রায়ই শুনতে পাই কোলা ব্যাঙের গাল কোলালে এই ডাক আর সোনা ব্যাঙগুলোর কটর কট শব্দ । তোমরা কেউ জান ব্যাঙ কেন ডাকে ?—জান না তো ? কিন্তু আফ্রিকার ছেলে মেয়েরা জানে । তারা কিন্তু খুব পছন্দ করে এই গল্পটা—তবে বলি ।

আফ্রিকার কোনও এক গহন বনে সাতটি ব্যাঙ থাকত । সাত ব্যাঙে একেবারে গলায় গলায় ভাব, যাকে বলে বুজ্জম্ ফ্রেন্ডস্ । সাত জনে এক সঙ্গে স্নান করে, ওঠে বসে, সব কিছুতে সাতজন ছাড়া ছয় জন হয় না । একদিন হয়েছে কি ?—সে এক মজার ঘটনা । সেদিন ব্যাঙগুলো খেতে পায় নি । সারাদিন সেই জন্তু খিদের আশায় অস্থির হয়ে সন্ধ্যা বেলায় সেই সাত ব্যাঙে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে ; যদি কোন একটা মরা জীব জন্তু পাওয়া যায় এই আশায় । এবনে সেখানে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় তারা দেখতে পেলো যে, এক মস্ত হরিণ মরে পড়ে রয়েছে । খাবার দেখে তো তারা আনন্দে নাচতে আরম্ভ করেছে । কিন্তু খেতে এসে তাদের চক্ষু স্থির । এখন হরিণটার খোলস ছাড়াবে কি করে । ব্যাঙদের তো আর নখ নেই । তারা খুব চিন্তায় পড়ল । গৌ গৌ করে কাঁদতে লাগল । এমন সময় একটা চিতাবাঘ সেই পথ ধরে যাচ্ছিল । ব্যাঙদের কান্নায় চিতাবাঘ বলল কিরে তোরা কাঁদচ্ছিস্ কেন ? কি ব্যাপার ! তখন ব্যাঙেরা বলল, এই হরিণটাকে কিছুতেই খোলস ছাড়িয়ে খেতে পারছি না হুজুর ! আপনি একটু দয়া করে ছাড়িয়ে দেবেন ? চিতাবাঘ বলল এ এমন শক্ত কাজ কি ? বলে খোলস ছাড়াতে লাগল । কিন্তু চিতাবাঘের আর ওঠার নাম নেই । সে খেতে শুরু

করেছে হরিণের নরম মাংস। ব্যাঙদের দিকে একদম ভ্রক্ষেপই নেই। তখন একটা বুড়ো ব্যাঙ বলে উঠল—ছজুর, আমাদের একটু দিন। তাই না শুনে চিতাবাঘ এমন এক ধমক দিলে যে ব্যাঙদের পিলে কেটে যাবার জোগাড়। তারা চুপ করে রইলো। কিন্তু অন্তবুড় হরিণটাকে চিতাবাঘ একা খেতে পারে? তার পেট ভরে গেলে হেউ ঢেউ করতে লাগল। শেষে আর খেতে না পেরে সে ব্যাঙদের বলল এটাকে তোরা পাহারা দে—আমি একটু ঘুরে আসছি, বলে সে চলে গেল। তখন ব্যাঙগুলো ভাবল কি করে চিতাবাঘকে তাড়ান যায়! তখনও প্রচুর মাংস অবশিষ্ট। অবশেষে একটা বুড়ো ব্যাঙ বলল ঠিক আছে, এখন মাংস খেলেই চিতাবাঘ যদি দেখে, তা'হলে আমাদের শুক খেয়ে নেবে। তার চেয়ে তোরা সব মরার মত পড়ে থাক—এবার বাঘ আশুখ না দেখি মজাটা টের পাবে বাছাধন। যেই না বলা বাঘও একটু পরে এসে হাজির। তখন সেই বুড়ো ব্যাঙটা হাউ হাউ করে কঁাদতে কঁাদতে বললে ছজুর বনদেবী এসে আমাদের এই ছয় বন্ধুকে মেরে ফেলেছে। তারা কত করে বললে যে আমরা হরিণ মারিনি। আর আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এই জন্তু যে প্রথমত আমি ছিলাম না, এবং বলেছে, যে মাংস খেতে আসবে তাকে সাবধান করে দিবি। যদি খায় তাহলে তার এই ব্যাঙদের মত অবস্থা হ'বে। বলে সে নীচে যে ব্যাঙগুলো পড়ে আছে, তাদের দেখিয়ে দিলে। এই কথা শুনে চিতাবাঘ এমন দৌড় দিলে যে একেবারে পগাড় পার। তখন ব্যাঙগুলো উঠে আনন্দে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ, কট্ কট্, কটর কটর তার মানে, কি আনন্দ, কি মজা—আমরা বাঘকে ঠকিয়েছি। কি বোকা বাঘ। সেই থেকে ব্যাঙদের আনন্দ হলেই ডাকে গ্যাঙর গ্যাঙ।

— — —

চারার চাড় /

গল্পটির বন্দোবাস্থায়

বাড়ির সামনে ছোট্ট বাগান। মিড়ানী দিয়ে গাভের গোড়া মিড়ো-
জিলো বীক। একসময় ওর হাতটা থেমে এলো। কি যেন ভেবে
টানটান হয়ে দাঁড়ালো। ওর মনে এলো রথের মেলার কথা—
কবে যেন রথের মেলা ?

বীক ভেবে পাচ্ছিলো না - রথের মেলা কবে। রথের মেলা
থেকে এবার কিছু নতুন চারা কিনতে হবে—লিলি, পকমুখী জবা
আর গন্ধরাজের। কিন্তু মেলা কবে ? রথ ? আষাঢ়েই তো
রথযাত্রা।

বীকর ভাবনা একে অস্থির করলো। কার কাছে জানা যায় ?
বাবা তো এখনও বাড়িতেই ফেরেনি। আর ফিরলেও বাবাকে
জিজ্ঞাস করা যাবে না। বাবার সাথে বীক বেশী কথা বলে না।
তবে মায়ের কাছে ? উ-হুঁঃ। সেও না। মা রথের মেলায় যাওয়াটা
মোট্টে পছন্দ করে না। পছন্দ করে না মেলায় গিয়ে পাঁপড়
ভাজা খাওয়া।

হঠাৎ বীক উজের টেনে ধরে দৌড় লাগালো। সস্তুর কথা মনে
হ'লো ওর। ওইতো সামনেই সস্তুর বাড়ি। ওর বন্ধু সস্ত। কিন্তু... ?
বীক কেমন ধাক্কা খাওয়ার মতো দাঁড়িয়ে পড়লো।— না। সস্তটার
কাছে গিয়ে কাজ হবে না। ও কী আর রথের মেলার খোঁজ
রাখবে ! ওদের বাড়িতে কোন গাছই নেই। ওরা একটাও চারা
পোঁতেনি কোনদিন। তা'ছাড়া সস্তটা আরো ওদের বাড়িতে এলে
কুল গাছের ভগা নখের মাথা দিয়ে কেটে কেটে নষ্ট করে যায়। ওর
আঙ্গুলের নখগুলো কোনদিন কাটে না সস্ত। নখের গোড়ায় ময়লা

কিশলয়ের মেলা ॥

জমলেও না। তবু গরম গরম পঁপড় ভাজার লোভে কী ও রথের খবর রাখবে ?—নতুন করে প্রেম জাগে বীরুর মনে। কিন্তু সাথ-সাথ উত্তর মিলে যেতে হতাশ হয়ে যায়। ওর মনে পড়ে—সস্তুরা রোজ চায়ের সংগে বাড়িতেই পঁপড় ভাজা খায়। বীরু নিজে গিয়ে দেখতে পেয়েছে।

এখন উপায় ? আর কার কাছ থেকে তাহলে জানা যায় খবরটা ? হুলাল ?—হ্যাঁ-হ্যাঁ ! হুলাল ঠিক বলতে পারবে। ও না পারলেও ওর বাবার কাছ থেকে ঠিক জেনে দেবে। ওদের বাড়িতে ফাকা জায়গা নেই। তবু ছাদের টবে ওরা মেলা—ই গাহ লাগিয়েছে। হুলালের বাবা হুলালকে নিয়ে গাছ চেনায়, সার দেওয়ায়, গাছের যত্ন আজও শেখায়। ওই তো বীরুকে বেল আর চন্দ্রমল্লিকার চারা দিয়েছিলো।

বীরু ফের দম নিয়ে ছুটেতে শুরু করলো হুলালদের বাড়ির দিকে। হুলালদের বাড়ি একটু দূরে। তবু হুলালের সাথে ওর বন্ধুত্ব আছে। বীরু গিয়ে হুলালকেই ধরবে।...

এটরে—মাষ্টার মশায় !—হঠাৎ যেন মাঝপথে বীরুর বুকের ভেতরকার দমটা কেটে পড়লো। ফুৰুৎ করে সরে গিয়ে ও একটা বাড়ির আড়ালে লুকলো। এভাবে ওকে হাঁপাতে দেখলে কী ভাববেন মাষ্টার মশায় ! বরং মাষ্টার মশায় এগিয়ে আসতে আসতে ও একটু জিরিয়ে নিয়ে তাঁর পেছন পেছন গিয়ে বাড়িতে উঠবে। হুলালদের বাড়িতে এখন আর যাওয়া থাকে না কোন মতে।

পড়তে বসেও বীরুর আপশোষ হ'লো—হুলালের কাছে যেতে না পারায়। মনে হ'লো, মাষ্টার মশায়কেই নয় জিজ্ঞেস করা যাক—কবে রথের মেলা। কিন্তু বীরু ঠিক সাহস পেল না।—পড়তে বসে মাষ্টার মশায় অল্প কথা শুধানো পছন্দ করেন না।

পড়তে-পড়তে, লিখতে-লিখতে, জানতে-জানতে, বুঝতে-বুঝতে
কিশলয়ের বেলা ॥ ৪৬

বীরুর কেমন ঘুম-ঘুম আসছিলো। মাথা থেকে রথের কথাটাও কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলো না। শেষ মুহূর্তে মাষ্টার মশায় উঠবার আগে আবার চারটে অঙ্ক দিয়ে বলে গেলেন, এ ক'টা এখনি করে রেখো। কাল এসে দেখবো।

অঙ্ক কষতে কষতে বীরু একসময় হেলে-তুলে গড়িয়ে পড়লো।— কীসী-ঘণ্টার আওয়াজ শুনলো ও। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো—হেলে-বুড়ো মিলে রথের রশি ধরে টেনে চলেছে। বীরু একছুটে এসে জানলা থেকে হাকসাটটা টেনে নিয়ে গলার ওপর দিয়ে গলিয়ে-ঝুলিয়ে দিলো। তার পরেই সে কার হাত ধরে—বাবার—বাবার হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো। কিন্তু বাবা কোথায়, বাবা নেই তো? বীরু আর তুলাল—তুলালের বাবার হাত ধরে দু'জন দু'দিকে। ওরা পাঁপড় ভাস্সা চিনোতে চিবোতে চারা গাছের মেলাতে গাছের চারা বাছতে লাগলো। কত রকম চারা, কত রকম গাছ, কত রকম ফুল। ও তুলে গেলো ও কিসের কিসের চারা নেবে ভেবেছিলো।

এাই বীরু..বীরু! এাই বীরু! খাবি না ওঠ। ও-ও-ওঠ না!—মায়ের হাতের ঠেলা খেয়ে আর মায়ের মুখের ডাক শুনে ও মাঝখানটায় চমকে উঠলো। দুই হাতের পিঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে একবার তাকালো।—মনে হলো, বাবা যেন ওপাশটায় খেতে বসেছে। ঘরের ভেতরকার ছাদ থেকে ঝুলে পড়া ইলেকট্রিকের বাথটা দূর নক্ষত্রের মতো কেমন যেন আবছা—কুয়াশা ঘেরা মনে হচ্ছে। না—ঘরের ভেতরকার নয়, চারাগাছের দোকানের আলোটা।

দাড়াও-ই-না, চারা ক'টা গুছিয়ে নিই।—বলে বীরু কের পাশ ফিরলো কীচা ঘূমে।

বিচিত্র মাছ-শিকার/

ডাঃ কান্তি রায়

ন'দাছ ছাড়াও ঘরে রয়েছেন ওঁর দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। এবজন হ'লেন মানিকতলার প্রতুল বক্সী আমাদের রাঙাদাছ, অপর জন আমাদের ভালোদাছ অর্থাৎ সোনারপুরের ব্যোমকেশ গুপ্ত। ওঁদের ঘিরে রয়েছি আমরা তিনজন। আমরা মানে ভোমলা, পিটি আর আমি। রাঙাদাছ আর ভালোদাছ আজই সকালে এখানে এসেছেন। সারাটা দিনমান ওঁরা কাটিয়ে এসেছেন সাজিরহাটের ডি-এস-বি পুকুরে। ছিপে মাছ-ধরা ওঁদের প্রচণ্ড নেশা। বয়সের ভারে হ্রাসজ্ঞতা সবেও। তিনজনে মিলে আজও কিছু কিছু মাছ ধরেছেন। রান্না-ঘরে মা ঐগুলি কেটে-কুঁটে ভাজা-ভাজতে ব্যস্ত। বাইরে ওঁড়ি ওঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। লাগাতার সন্ধ্যাবহার করে তেলে-ভাজা সহযোগে মুড়ির পাত্র আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি। সঙ্গে গরু। স্বভাবতই আসর যার পর নেই জমে উঠেছে।

•

•

ন'দাছ আর রাঙাদাছ একে একে কিরিস্তি দিলেন কবে কোথায় তাঁরা পনের কুড়ি কেজির ওজনদার বিভিন্ন মাছ ধরেছেন, ঐ সব ক্ষেত্রে কত মেহনত তাঁদের করতে হয়েছিল, পারদর্শীতায় ঘাটতি হ'লে তখন কি কি ঘটতে পারতো, ঐ সব মাছকে জল থেকে ডাঙায় তুলতে কত সময় লেগেছিল ইত্যাদি... ইত্যাদি। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার সরস গল্প। হঠাৎ রাঙাদাছ, ভালোদাছর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন,—

—‘ক গো ব্যোমকেশ, তুমি যে একেবারে চুপ্টি মেরে গেলে! কিছু অস্তত বলো। তা নৈলে ছাড় পাবে কেন?’

এতক্ষণে আমাদের খেয়াল হ'লো,—সত্যিই তো, ভালোদাছ অনেকক্ষণ মাঝে এক কোনে স্পিক্‌টি নট হয়ে বসে রয়েছেন। সবাই মিলে চেপে ধরলাম। অগত্যা গলা সাক্ করে তিনি বলতে শুরু করলেন—

—‘আমি যে ঘটনা বলবো তা’তে পনের-কুড়ি কেজি ওজনের কোন ব্যাপার স্থাপার নেই। বড় জোর তিন কি সোয়া তিন কেজির মাছ। তা-ও আবার একটা নয়—পাকা এক জোড়ায়!’

শুনে আমরা একটু দমেই পেলাম। এমন ডাক-সাইটে শিকারী ভালো দাছ তবে কী আমাদের ছেলে ভোলানোর ফাঁদে ফেলতে চাইছেন! আমাদের ভড়কানো মুখগুলির উপর দিয়ে ভালোদাছর ঘোলাটে চোখ দুটি যেন সার্চ-লাইটের মতো ঘুরে গেল। আমাদের আশঙ্ক্য করতেই যেন তিনি যোগ করলেন,—

—‘আরে শোনই না। ভালো লাগতেও তো পারে’। তিনি শুরু করলেন—

—‘তখন আমার কতই বা বয়েস। সবে তেরো কি চোদ্দ। সেদিনও স্থল থেকে বাড়ী ফিরে বই-পস্তর রেখে কোন রকমে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে বেড়িয়ে পরলাম। সঙ্গে হাত ছিপ। রোজকার মতো সেদিনও গিয়েছিলাম কৈ, সিজি বা পুঁটি জাতীয় মাছ ধরবার লোভে। ঐ দিনই ঘটলো এক ঘটনা’……

—‘কি ঘটলো?’ বলে প্রায় সমস্বরে আমরা টেঁচিয়ে উঠলাম। লক্ষ্য করলাম ন’দাছ এবং রাঙা দাছও উৎসুক দৃষ্টিতে ভালো দাছর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

নাকে এক টিপ নস্টি গুঁজে রুমাল দিয়ে নাক ঝেড়ে ভালো দাছ আবার খেই ধরলেন,—

—‘বাড়ী ফিরতে মনস্ত করে জল থেকে তোলবার জন্তে সবে ছিপে হাত দিয়েছি কি দিইনি। এমন সময়ে দেখলাম গালপাট্রা

ফোলানো বিরাতাকৃতি এক শোল মাছ ধীর গতিতে চলে এলো আমার প্রায় দেড় হাতের ব্যবধানে।' ভালো দাছ কণিকের জেষ্ঠ্য ধামলেন।

—আর অমনি তুমি তোমার হিপ ওর মুখের সামনে ধরলে, তাইতো?' ভোমলা শুধালো।

—‘আমার ঐ কক্ষির ছিপে শোল মহারাজকে রাখা-কি সম্ভব ছিলো—দাছতাই? না-কি সূতো আর বড়শীর ছিলো সেই ক্ষমতা?’ পান্টা প্রশ্ন করলেন ভালোদাছ আমাদের দিকে তাকিয়ে। ন’দাছ বললেন—

—‘তা হ’লে পলো টলো বা ঐ জাতিয় কিছু দিয়ে’

—‘এখান থেকে আমাদের বাড়ী অন্ততঃ দু’মিনিটের পথ। এতটা সময় মাছটা কী অপেক্ষা করে বসে থাকতো বলে তুমি মনে কর?’

ন’দাছর কথায় বাধা দিয়ে ভালো দাছ তাঁকে পান্টা প্রশ্ন করে বসলেন।

—‘তবে কী বড়দের কাউকে সাহায্য-টাহায্যের জেষ্ঠ্য তুমি ডাকলে, ভালো দাছ?’ বড় বড় চোখ করে পিটির জিজ্ঞাসা।

—‘না, দিদিভাই’—বললেন ভালো দাছ। তিনি যোগ করলেন—

—‘শিকার আর শিকারী দেড় হাতের ব্যবধানে। বলতে গেলে মুখোমুখী। ধীরে সূস্থে বিবেচনা করবার অবকাশটা কোথায়? পলক না পড়তে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে শিকার কস্কাবেই। অগত্যা আমি এক বিচিত্র কর্ম করে বসলাম। অর্থাৎ কী না—পায়ের উপরে দেহের ভারসাম্য রেখে সামনের দিকে খুঁকে ছ’হাতের শক্ত মুঠিতে সাড়াশীর মতো মাছটাকে ঝাঁকড়ে ধরলাম’... তাঁর বক্তব্য শেষ করবার আগেই ন’দাছ বলে উঠলেন—

—‘আর অমনি মাছটা সুর সুর করে জল থেকে তোমার হাতে চলে এলো?’—তাঁর চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ।

কিশলয়ের মেলা ॥ ৫০

—‘বলতে গেলে অনেকটা তাই’—ঠাণ্ডা গলায় ভালোদাছর জবাব।

—‘কিন্তু ভায়া’, রাঙাদাছ বললেন—‘আমরা যদুদ জ্ঞানি,—
যেমনি রাস্কুসে শোলমাছের চরিত্র, জলে তেমনি আশুরিক ওর শক্তি।
বিনা বাধায় কেমন করে তুনি ওকে কাবু করলে ঠিক বোধগম্য
হচ্ছে না।’

বলা বাহুল্য, তাঁর কণ্ঠেও অবিশ্বাসের সুর।

ভালো দাছ আবার খেই ধরলেন—

—‘আমারও সে ধারণাই ছিলো। এমন কি আজও সে রকমট
তো জ্ঞানি। সত্যি কথা বলতে কি, ভীমের গদার মতো ঐ টাউস
শোলটাকে সে বয়সে খালি হাতে শিকার করবার কষ্ট, কল্লনা করা
আমার মাথাতেও ছিল না। ভেবেছিলাম সারাটা বিকেলের শ্রম যখন
পণ্ড হয়ে গেছে, তখন না হয় বাড়তি আরেকটু নাজেহাল হওয়া যাক।
শ্রেক একটা চেষ্টা বৈ তো নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো প্রায়
উন্টো। হু’হাতে কপাৎ করে আঁকড়ে ধরতেই মাছটা সামান্য ছটকট
করলো। তাতে অবশ্রি আমার খুব একটা বেগ পেতে হয় নি।
বাস্, তারপরেই গাল কোলানো সেই শোল-মহারাজকে নিয়ে কাড়ীর
দিকে ‘পড়ি কী মরি’ মার্কী ছুট। উৎসাহের আতিশয্যে ভুলে
গেলাম যে নিভা সন্নী ছিপটা ওখানেই পড়ে রইলে! কাড়ীর দাওয়ায়
ওকে সযত্নে রাখবার আগেই ঘটলো আরেক কাণ্ড...।

—‘আবার কি হ’লো?’ ভোমলার প্রশ্ন।

‘রুক সমান উচু থেকে মাছটা পিছলে হটাৎ ধপাস করে মাটিতে
পড়ে গেলো!’—ভালোদাছর জবাব। এতক্ষন পরে তিনি নাকে
জুঁসই ভাবে আরেক টিপ নস্টি গুঁজলেন।

—‘এ গল্পের কি এখানেই শেষ?’—ভালো দাছর প্রতি আমার
জিজ্ঞাসা।

‘উহ, আসলটাই তো এখনো বাকী’— তাঁর মন্তব্য ।

—‘আচ্ছা,—ভালোদাছ, তুমি জোড়া মাছের কথা বলেছিলেন না? তার কী হ’লো?’—পিটির তাড়া ।

—‘আরে সেটাই তো হচ্ছে, দিদিভাই’— বলে তিনি আবার খেই ধরলেন,

—‘যেই না মাহটা মাটিতে আছড়ে পারলো, দেখা গেল সেখানে একটা নয়, দু’ছটো মাহ’ ।

‘কেমন করে’—হতভব হয়ে সমস্তরে আমরা জিজ্ঞেস করলাম ।

—‘ই্যা দু’ছটো, একটা শোল আর অপরটা কৈ মাহ’।—তিনি জানালেন ।

ততক্ষণে আমরা অবাক হওয়াও যেন ভুলে গিয়েছি ।

ভালোদাছ আবার বলতে শুরু করলেন,—

—‘আর আশ্চর্যের বিষয় কী জানো—শোল আর কৈ, ছটো মাহই তখন সবগে তিড়িং বিড়িং লাফাতে শুরু করেছে । খানিকটা আগেও এমন বিক্রম দেখালে ঐ পেলাই শোলটাকে ধরা আমার সাধ্যো কুলাতো কি-না সন্দেহ’ । অধৈর্য হয়ে ভোমলা জিজ্ঞেস করে বসলো,—

—‘শোলটার কথা নয় তো বুঝলাম । কিন্তু কৈ’টা এলো কোথেকে?’ ন’দাছ ভো বলেই বসলেন—

—‘ব্যোমকেশ, তোমার এ সব আঘাতে গাল গপ্পো থামাবে ভাই? আর যে পারা যাচ্ছে না’

এতক্ষণে ভালোদাছ হাঃ হাঃ হাঃ করে বেদম হেসে উঠলেন । হাসির গমক কমলে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন,—

—‘রহস্তটা ধরতে পারলে না? তবে শোন, ঐ যে বললাম শোলটা ছিলো ইয়া গালপাট্টা ফোলানো,—সেটাই সব । আসলে শোলটা ঐ কৈ’টাকে জলযোগ করতে চেয়েছিল । আর সেটাই

কিশলয়ের মেলা

হ'লো ওর কাল। তাড়াহুড়া করবার জন্তেই হোক কিংবা আত্মরক্ষার্থে কৈ'টার আশ্রয় ছটকটানির জন্তেই হোক, ওটা মানে কৈ মাছটা ওর উপরের নীচের কাটার সাড়ি সহকারে শোলটার মুখের ভিতরে আটকে যাওয়ায় শোল মাছটা শত চেষ্টা করেও না পেরেছে কৈ'টাকে গিলে ফেলতে, না পেরেছে উগড়ে বার করে দিতে। এবারে বুঝতে পারলে তো কেন শোলটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো?—বলে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। বলা বাহুল্য, আমরা সম্মতি সূচক ঘাড় কাৎ করলাম। এতক্ষণে শুরু হয়েছে আমাদের সখিত করার পালা।

—উঁহু থেকে মাটিতে আছড়ে পরাতেই শোলটার মুখ থেকে কৈ মাছটা ছিটকে বেড়িয়ে এসেছিলো, তাই না ভালোদাছ?

আমি শুধালাম!

'হ্যাঁ' একটা মাত্র শব্দ খরচ করে এবারে জবাব দিলেন ন'দাছ। ঘরে বিরাজিত সাময়িক স্তব্ধতা ভেঙ্গে রাঙাদাছ গলা খঁচকাড়ি দিয়ে বললেন,

সব গল্পেরই তো একটা না একটা মর্যাদা অর্থাৎ কি-না শিক্ষা-টিক্সা থাকে। এ গল্পের মর্যাদা কি বলতো ভোমলা দাছভাই।'

—'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। সাদা-মাটা কথায় শোলটা যদি তড়ি ঘড়ি কৈ'টাকে অমন বে-হিসাবির মতো গিলতে না যেতো, তা'হলে ওকে এভাবে মরতে হতো না, তাই না রাঙাদাছ?'

ভোমলা জানালো।

ততক্ষণে পিটি উৎসাহে লাকিয়ে উঠেছে। সে শুধালো,—

—'আমি বলবো, রাঙাদাছ?'

সম্মতি আদায়ের পর সে বললো,—

—'ভাগ্যকে রাখা যায় না। ভালোদাছের কপালে ছিলো মাছ পাওয়া—ব্যাস্ পেয়ে গেলেন অমন তাগড়াই মাছ।'

—‘কিন্তু সঙ্গে চেষ্টা-চরিত্রের কথাটাও তো বলতে হয় দিদিভাই !
অসম্ভব ভেবে যদি তোমার ভালোদাছ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেন
তবে কী জুটতো তাঁর বরাতে ঐ মাছ ?’

ন’দাছ যোগ করলেন ।

—‘তোমারটা এখনো সুনলাম না দাছভাই ! তুমিও কিছু
বলো—’

এবারে আচমকা আমাকেই প্রশ্ন করলেন রাঙাদাছ ।

কীচু মাচু মুখ করে বললাম—

—‘একটা ছোট্ট কিছুকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হ’লে, সেটা
তার চেয়েও বড়ো কোন কিছুর বিপক্ষে যথেষ্ট বিপদের কারণ হ’তে
পারে, কৈ মাছটা—যেন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে, তাই না ?’

পিটি এবারে শুখালো,—

—‘কার জবাবটা ঠিক, ভালোদাছ ?’

—‘সক্কালের’

বললেন ভালোদাছ । তাঁর মুখে ফুটে উঠলো রহস্যময় হাসি ।
ততক্ষণে রান্নাখর থেকে খবর এসেছে তাজাতাজি শেষ । এখন
বসলেই হয় ।

Phone : UTTA 1227
(Dial 63 For Uita EXCH)

ARNALOK ALLOYS

(WHITE METAL DIVISION)

Manufacturers of Antifriction Bearing Metals, Tin solders
Aluminium solder, Low Fusion Alloys etc.

To

I. S. B. S., I. R. S., A. S. T. M. SPECIFICATION.

Works and office :

6. CHAUDHURY PARA STREET
UTTARPARA HOOGHLY



ভূত-বাগানের গম্পা

বাণীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়
(একটি সত্য ঘটনা)

গৃহবহর পূজোর ঠিক আগেই আমি একটা টিউবানী পেলাম। আমার ছাত্রের বাড়ি রেলস্টেশন থেকে পাকা রাস্তা ধরে পায়ে তেঁটে মিনিট কুড়ির পথ। আরেকটা পথ বাগানের মধ্য দিয়ে, আজ সেটাতে লাগে পাঁচ-সাত মিনিট সময়। কিন্তু ঐ পথে দিনের বেলাতেই কেউ একা চলতো না, আর রাতে তো কথাই নেই! আমি দিনের বেলাতে একদিন পথটা চিনে রেখে ছিলাম; সরু একটা পায়ে-চলা পথ, চারপাশে বড় বড় গাছের ভিড় আম-দেবদারু সাইবট-শিঙ-তেঁতুল পাতায় পাতায় দিনের আলোও আটকে দেয়। স্টেশনের কাছে এসে একটা বড়সড় বাড়ি আর তার লাগোয়া একটি সান ষাধানো পুকুর পড়ে— সমস্তটারই দশা জরাজীর্ণ! যা'হোক আমি যে দিনের কথা বলছি, সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। ট্রেনের গুণগোলে আমি স্টেশনে নামলাম রাত সাড়ে আটটার সময়; অথচ পরদিন জ্যোৎস্না রাত, উইক্লী পরীক্ষা আছে, আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু কত রাস্তার আর করবো? ফলে, পা বাড়ালাম সেট বাগানের পথে। আমার অবশ্য ভূতের ভয় ছিলো না। ভয় ছিলো সাপটাপের। ভাবলাম জ্যোৎস্না রাত, আবছা আবছা দেখতে পেলোও চলে যেতে পারবো। দু'চান পা যেতেই মনে হলো একটা সঙ্গী পেলে ভালো হয়, কেমন

বিশ্বকরমের খেলা ॥

যেন গা ছম ছম করছে। আর আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আমার সামনে কে যেন যাচ্ছে। শুধু তাই না তার সামনে গোল হয়ে এতটুকু আলো পড়ছে! আমি তাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম, সে শুধু সৰু একটা হাত ভুলে বসে, সে বড় রাস্তার দিকেই যাবে। আবছা আলোতে দেখলাম তার আঙ্গুলগুলো বা হাতখানা যেন শাদা শাদা হাড়ই শুধু। লোকটা আমাকে হাতছানি দিলো; এর পেছনে পেছনে একটা গাছের ফাঁক দিয়ে গিয়ে একটা বাঁশের সীকো পেরোতেই দেখি একটু দূরে আমার ছাত্তের বাড়ির আলো জ্বলছে, তা দেখা যাচ্ছে! লোকটাকে পেছন ফিরে আর দেখতে পেলাম না! বাগান থেকে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো!

ফেরার সময় গাড়িয়ে ওঠে দেখি লাষ্ট ট্রেন ছাড়তে আর দশ বারো মিনিট সময় আছে! ছাত্তের বাবা সেদিন লাষ্ট ট্রেনেই ফিরবেন; এর মা নিরুপায় হয়েই আমাকে বাগানের পথে যেতে সম্মতি দিয়ে বললেন, এই মোমবাতিটা রাখো, আগুনে অপদেবতা কাছে আসে না, আর সে রকম দেখলে বাপু গায়ত্রী অপ ক'রো, দেখবে কিছু করতে পারবে না ওরা।

আমি তুর্গা তুর্গা করে বাগানের পথ ধরলাম। বাউরে চাঁদের আলোয় পৃথিবী ভাসছে অথচ বাগানের ভেতরে ঘন অন্ধকার। এবারে আর সেই বাঁশের সীকোটা পেলাম না, চেনা পথেই ঢুকে জোর ঠাঁটতে লাগলাম।

এবারে কিন্তু আমার গা ছম ছম করছিল। মনে হ'ল কাউকে পেলে খুব ভালো হয়। তখনি হঠাৎ দেখি আমার আগে আগে যেন সেই লোকটাই এগোচ্ছে। হাতে সেই আলো, যা সামনের রাস্তার ওপর খুব নিম্প্রভ ভাবে গোল হয়ে পড়েছে। আমি বললাম, আপনি কি ষ্টেশনে যাবেন? ও দাদা,—যদি ষ্টেশনে যান তো একটু আস্তে চলুন আমি ও ষ্টেশনে যাবো! আবার সেই সৰু হাত বার করে বললে, ওকে অনসরণ করতে!

কিশলয়ের মেলা ॥

ও আগে আগে, পেছনে আমি, মাঝে হাত তিনেক কারাক। সেটুকু আর কমছে না। হঠাৎ দেখি লোকটা একটা গাছের মগডাল হাত বাড়িয়ে টেনে নামাল! আর তারপরই বৃকেঘষে উঠে গেল গাছের মাথায়। সাপ যেভাবে দেওয়াল বেয়ে উঠে, সেই ভাবে সে বৃক চিত্তিয়ে মিশে গেল গাছের পাতাতে! যে আলো তার হাতে ছিল বলে মনে হচ্ছিল, তা আর দেখতে পেলাম না! গাঢ় অন্ধকারে ভয় উপেক্ষা করে নিজেকে বোঝালাম, ওটা চোখের ভুল; ওর আলো নিভে গেছে বলে দেখতে পাচ্ছি না। আমি বললাম, ও দাদা কোথায় গেলেন, দেখতে পাচ্ছি না যে! সব নিস্তক! আমি মোমবাতির টুকরোটা জ্বাললাম! সেই গাছটা দেখলাম একটা বিরাট বেলগাছ!

যাহোক, হাত-আড়াল করে হুঁপা এগোতে না এগোতেই দেখি সামনের গাছ থেকে কি সব শাদা শাদা ঝুলছে। কি ঝুলছে দেখবো ভেবে একদম কাছেরটার কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে সারা গা দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শ্রোত বয়ে গেল! একটা মানুষের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় ঝুলছে! শেঁ করে একটি নিশ্বাস যেন গায়ে লাগল, কানে ভেসে এল ফুঃ করে একটি আওয়াজ! চারপাশে একটা গোঙানীর আওয়াজ উঠতেই বাতিটা গেল নিভে, আর সঙ্গে সঙ্গে সারা বাগান জুড়ে একটা হাসির রোল উঠল হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তবুও জোর করে বাতিটা জ্বাললাম। আবার কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বাতিখানা! আমি মুখদিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করলাম। মনে হ'ল সামনের রাস্তাটা একদম ফাঁকা। মনটাতে একটু সাহস এলো, খুব জোরে হাঁটতে লাগলাম। যেমন করে হোক ট্রেনটা ধরতেই হবে। অন্ধকারে কোথায় হাঁটছি তা বুঝতে পারছি না। পায়ের তলায় যেটাকেই পথ বলে মনে হচ্ছে সেটাকেই ধরে এগোচ্ছি। আর সারাদেহ ভয়ে কেমন যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চেয়ে দেখি আমি সেই বাগান বাড়িটার

সামনে এসেছি। ওপরের দিকে চোখ তুলে আমি থ' হয়ে গেলাম ! তলপেটের তলা থেকে কেমন একটা কনকনানি শুরু হয়ে গেল। আমার সামনেই হাত ছয়েকের মধ্যে সেই বিরাট বাড়িটা, আর তার ছাদে এক বিরাট কালো মূর্তি বসে আছে। বাড়িটা তেঁতলা, সেই তেঁতলার ছাদে সে বসে আছে, তার মাথা ছুঁয়েছে যেন পাঁচ-তলার ছাদ ! ছুটো চোখ আগুনের গোলার মত জ্বলছে, খরগোশের কানের মত লম্বা লম্বা ছুটো কান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছুটো হাত ওই বিরাট বাড়ির পূর্ব আর পশ্চিমের দেওয়ালে পেতে রাখা— অনেকটা মাদল বাজানোর ভঙ্গীতে, আর ছুটো পা মাটিতে এসে ঠেকেছে ! ভয়ে আমার সর্বদেহ কাঁটা দাঁড়িয়ে আছে, মুখ দিয়ে ঢোক নামছে না— চোখেও পলকস্থির !

কানে ভেসে এল, আবার সেই কান্নার শব্দ ; মনে হ'ল হাজার হাজার কুখ্যাত মানুষ যেন "খেতে দাও—জল দাও" বলে বহুদূর থেকে চিৎকার করছে। হঠাৎ সেই বিরাট কালো লোমশ মূর্তি ঝিক্ করে একটা শব্দ করে শাদা শাদা বিরাট দাঁত বার করলো, পূর্বদিকের হাত দিয়ে পুকুর থেকে একটা জ্যাস্ত বড় কি মাছ তুলে দাঁতে ঠেকিয়ে কামড় দিল !

আমার তখন জ্ঞান হারিয়ে আসছে, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ, পুরোহিতের মত চেহারা, আমাকে হাত ধরে নিয়ে, চলতে লাগলো। তাঁর চেহারা বেশ সৌম্য, সে তাড়াতাড়ি করে আমাকে নিয়ে বাগানটা প্রায় পার করে আঙ্গুল দেখিয়ে রাস্তাটা চিনিয়ে দিল।

আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা, সেই ব্রাহ্মণ, সেই আগের লোকটার মত আবার একটা গাছে মিলিয়ে গেল !

আমি ষ্টেশনের আলো দেখে, প্রাণ পণে দৌড়ে এসে দেখি গাড়িটা ছাড়ছে—লাফিয়ে উঠেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম !

— — —

বাডুঘো মশাইয়ের। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করলেন না তিনি, বরং বললেন আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে, তোমরা যখন বলছ। ভেবে চিন্তে একটা উপায় বার করলেন। এমন উপায়, যাতে দুকুলেই রক্ষা পায়, বন্ধুরাও খুশী হবে, আবার ভোলানাথও কিছু মনে করবে না। ঠিক করলেন, ঈংরাজীতে গালাগালি দেবেন, ভোলানাথ মুখা মুখা মানুষ ঈংরাজী-টিংরাজী বোঝে না, পরের দিন বন্ধুগণ এলেন, এসে অবাকই হলেন। অবাক হলেন বাডুঘো মশাইয়ের কথা বার্তা শুনে, ভোলানাথকে একবার কি একটা কাজে ডাকলেন বাডুঘো মশাই তা ভোলানাথ একটু দেরী করে, বাডুঘো মশাই বন্ধুদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন কোথায় ছিলি রে ইডিয়েট? ভোলানাথ ঘাড় চুলকে জনাব দেয়, এঁকে পোষ্টাপিসে গিয়েছিলাম। পোষ্টাপিসে? পোষ্টাপিসে কেন?—এঁজ্ঞ, আপনার টেবিলে দুখানা পোষ্টো কার্ড পাড়ে ছেল, পোষ্টো করতে জুলে গিয়েছিলেন, তাই আমিই.....! তুই দেখছি একটা টুপিড! আচ্ছা যা এখন, ভোলানাথ চলে যায়, বন্ধুরা খুশী হয়ে বলে হ্যাঁ এই রকম এই রকমই চলেবে। একদিন তেল দিয়ে বাডুঘো মশাইয়ের গা মালিশ করার সময় ভোলানাথ বলে আচ্ছা বাবু, ইডিয়েট মানে কি আর ইটুপিট মানেই বা কি? ওর ছোটো বুঝি ঈংরাজী কথা? মুশকিলে পড়লেন বাডুঘো মশাই, মহা মুশকিলে, খানিক ভেবে বললেন, কী জানিস! ইডিয়েট মানে হল বড্ড ভালো মানুষ। আর টুপিড মানে হল ঠায়ে বুদ্ধিমান। এরই কিছুদিন পরের কথা, বাডুঘো মশাই বাজারে বেশ বড় বড় ইলিশ মাছ দেখে লোভ সামলাতে না পেরে কিনে কেলেল একটা। সেটা ভোলানাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, খুব ভালো করে রান্না করবি বুঝলি? ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ভোলানাথ। বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে বাডুঘো মশাই ডেকে নিলেন, রায় মশাই, দস্ত মশাই আর মুখুঘো মশাইকে বললেন, চল চা আর ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়া যাবে ইলিশ মাছ নিয়ে ভোলানাথ ঢুকলো রান্না ঘরে।

বাড়ুযো মশাইরা ঢুকলেন বৈঠকখানা ঘরে, ভোলানাথ মাজ
 কুটেতে গিয়ে দেখে মাছটা পচা। বেশ পচা, সে সঙ্গে সঙ্গে
 বাড়ুযো মশাইকে বলল, বাবু টাকাটাই দণ্ড হল। কেন...কি হল
 রে? বাড়ুযো মশাই জিজ্ঞেস করলেন। আবার কি হবে—আপনাকে
 ইডিয়েট পেয়ে ঠকিয়ে দিয়েছে মাজওয়ালা। বাড়ুযো মশাইকে
 ইডিয়েট বলাতে আত্ননাদ করে ওঠেন তাঁর বন্ধুরা। বলেন, কী
 বলছ তুমি ভোলানাথ! আপনারই বলুন বাবু, আপনারা হলেন
 গিয়ে ইষ্টপিট। আপনারাই বলুন এটা তার ধর্মে সইবে! ঢোক
 গিলে, চোখ বড় বড় করে মুখ্যোমশাই বললেন ওহে ও বাড়ুযো।
 মিট মিট করে হাসতে হাসতে বাড়ুযো শুধু বললেন উঁ।



॥ পিঙ্ক, ভারাইটা প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড ডায়ার্স ॥

স্টেশন রোড (পশ্চিম), নব বারাকপুর ২৪ পরগণা।

এখানে আধুনিক ও রুচি সম্বৃত ডিজাইনে

সব রকম শাড়ী ছাপা ও পাকা রং করা হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

মেলা /

ঐশীমান

“ঠাণা গুনচো ? কি কবিতা লেখা হলো ?”—এই কথা বলতে বলতে সুমিতা স্মিতহাস্তে এক কাপ চা নিয়ে স্বামী নীরেনের ঘরে প্রবেশ করে। নীরেন দীর্ঘ কথায় কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

বাবা এত বড় দীর্ঘ নিশ্বাস ? নাও ‘চা’ খাও। ও তুমি এনেছো ...নাও ‘চা’ নাও, এ বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল নীরেন।

চা এ চুমুক দিয়ে বলে ওঠে নীরেন...চমৎকার...গুড়ের চা। আচ্ছা বলতে পার, আমরা এতদিন বোকার মত চিনির চা কেন খেয়েছি। ৬ টাকা করে চিনি...কেউ কি কোনদিন ভাবতে পেরেছে ...উঃ! দেখো এবারে কোন কাপড় চোপড় আর কেনা যাবে না পুজোয়। হিমসিম খেয়ে গেলাম তোমার সংসার নিয়ে।

হেসে সুমিতা বলে, তোমাকে দেখে তাতো মনে হয় না, এর মধ্যে কবিতাও তো লিখছো।

কবিতা নয়...কবিতা নয়...বিজ্ঞাপন দার্ভাদের জন্তু আমোদিত রেডিওর বিজ্ঞাপন।

কোন দোকানের ?

নিউ বেনারসী হাউসের।

দেখি দেখি,...নিউ বেনারসী হাউস ১৫/১/১ মহাত্মাগান্ধী রোড, ফোন-৩৪-৮৮৮৩। মাথা নীচু করে পড়ে সুমিতা।

কিশোরের মেলা ॥ ৬৫

এই মাগ্গীর বাজারে
মাগ্গুয় আসে হাজারে
নিউ বেনারসী হাউসে
বলতে পারেন কি আছে ?

বলুন না ভোলানাথ চ্যাটার্জী বাবু আপনারা বলুন ।
ভোলানাথ চ্যাটার্জী—আমাদের দোকানে স্থলভ মূল্যে সমস্ত
রকম শাড়ীর আয়োজন করেছি ।

মুন্সীল মুখার্জী—বেনারসী শাড়ীর এত কম দাম কোথায় নেই ।
মুন্সীল ব্যানার্জী—এত কম দামে কেউ দিতে পারবে না কারণ
আমরা আমাদের কারখানার দরে কাপড় বিক্রী করি ।

কুমারী রূপি—মায়েরা আসবেন ।

কুমারী বৃন্দা—বোনরা আসবেন ।

অশোক চ্যাটার্জী—সকলেই আসুন...সর্বপ্রকার রেশমী, শিখ,
ভাতের কাপড়ের বিপুল সমারোহ শাড়ীর মেলা ।

সুমিত্রা মুখ উচু করে বলে...বাঃ বেশতো লিখেছে! তাই
নাকি—বলে নীরেন, এর পরে নিউ বেনারসী হাউসের...শাড়ী
মেলায় তোমাকে নিয়ে যেতেই হয় কী বলো ? দুইজনের উচ্চ
হাসিতে ঘরখানি ভরে যায় ।

সাক্ষাৎকার

দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যার তুলার মত নমনীয় সেই
যশস্বিনী ব্যায়াম পটিয়সী—কুমারী অধ্যাপিকা মজুমদারের সঙ্গে
সাক্ষাৎকার আগামী সংখ্যায়

—অভিযুগ

ছুড়া

এক ছুই তিন

বংশবাটির হংস খাড়ার
বাস ছিল সেই গাছতলা ।
কিন্তু ঠঠাৎ কেমন ক'রে
তুলছে এখন পাঁচতলা ?
জাহাজ ভরে গাদা গাদা
চালান নাকি দিচ্ছে আদা,
কিন্তু দাদা নয় তা খাঁটি -
ভেজাল তাতে কাঁচকলা ॥

হগ্‌সাহেবের মার্কেটে যান
সেন সাহেবের দোস্ত,
রোববারে তাঁর মাসখান্ডি
খাবেন আলু-পোস্ত ।
পোস্ত কথার ইংরিজিটাট
আসছে না আর ওঠে,
রেষ্টুরাতে ভাবতে থাকেন
কামড় দিয়ে টোস্টে ॥

তোর নাকি সে পিসতুতো ভাই
তুই নাকি তার মামাতো ?
সেই নাকি ঠিক দ্বপূর রাতে
প্র্যানচেটে ভূত নামাতো ?
কুতরা এসে অটোগ্রাফের
খাতায় ছোট-বড় মাপের
সই দিলে সে তাই নিয়ে কি
কেবল মাথা ঘামাতো ?

কিশোরের বেলা

রাম ছাগলের নাছ ॥ মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী

রাম ছাগলের বাচ্চা ছিলো সামনে খুঁটোয় বাঁধা,
দেখলো চেয়ে নাচছে সুখে চৌধুরীদের হাঁদা ।
ভাবলো মনে এমন নাচন নাচতে পারে সে ও
অবাক হবে দেখলে চেয়ে হয়তো বাড়ির কেউ ।
নাচতে কোন চাই না ট্রেনিং—কিংবা তোলক ঢাক,
তুকী নাচন নেচে সবায় লাগিয়ে দেবে তাক ।
যেট না ভাবা চার পা তুলে রাম ছাগলের ছা
উচিয়ে দাঁড়ি মুগু নাড়ি, নাচছে কি বাঃ বাঃ ।
বাঁধন হলো বজ্র বাঁধন করছে পটাং পট—
চিংপটাত্ত—হাড্ডি বৃষ্টি ভাঙলোরে পট পট ।
চক্ষে দেখে গোলক ধাঁধা—সর্ষে ফুলের রং
মালিক বলে “আর বাঁচিনে দেখে ব্যাটার ঢং ।”
লগুড় এনে মারলো পিঠে বেদম জোরে ঘা—
নাচ খামিয়ে চৌচিয়ে ওঠে রাম ছাগলের ছা ।

॥ ইউরেকা ॥

টেলার্স ক্লাব মাস্কেন্ট

(নব বারাকপুর বয়েজ স্কুলের সামনে)

নব বারাকপুর, ২৪ পরগণা ।

অথ চিংড়ি কথা ॥ গোপাল দাস কাব্যভারতী

কাঁকড়া বলে চিংড়ি ভাই—চল তীর্থে যাই,
বুলাবনে করলে বাস—মরণ ভয় নাই ।
জীবহিংসা করে না কেউ—সবাই 'হরি' বৈ
কঙ্গীধারী বৈরাগী সব—নামের বলে চলে ।
যমুনাতে খেলবে সুখে—অক্স সেথা নাই,
চলো চিংড়ি দুই জনেতে—বুলাবনে যাই ।
চিংড়ি বলে মিঠে জলে—যত আরাম পাই,
পশ্চিমেতে রুক্ষ দেশে—তেমন সুখ নাই ।
এখানেতে সুখে ছুখে—কাটিয়ে দেব কাল,
এবাসেতে সুখ নাই—অশেষ জঞ্জাল ।
পরার্থে জীবন দান—আমাদের ব্রত,
তার চেয়ে বড় ধর্ম—আর কোথা কত ।

হাসছে কেন বলতো ?

বাবা—বেইমান কথার অর্থ কি ?

ছেলে—নিজের অভাব ।

বাবা—তার মানে ?

ছেলে—বে মানে অভাব আর ইমান মানে বিবেক অর্থ্যাৎ আমি ।

বাবা—ওরে হারামজাদা ।

মাসির ছড়া ॥ দীপা চক্রবর্তী

মাসি গো মাসি
কিসের হাসি ?
ফুল ছড়ানো
রাশি রাশি ।
মাসি গো মাসি
কিসের হাসি ?
ঢাক বাজে আর
বাজে কাসি ।

মাসি গো মাসি
হো-হো হাসি ।
টুটুলসোনা
যাচ্ছে কাশি ।
ও মা ! ও মা !
পটকা-বোমা !
আলাই-বালাই
ছুটে পালাই ।

—o—

ধরা পড়েছে সবাই ॥ পূর্ণেন্দু বসু

চালনেই চুলো চায়—নাক নেই নখ,
ভাঙ্গাচোরা গাড়ী, তবু—চলা চাই পথ
দেহ নেই তবু ছিরি—রাখতেই হয়,
মাথা নেই, আছে চুল—তবু কর ভয় ?
যন্ত্রর মন্ত্রর—বুদ্ধিতে ঠাসা,
জীবনটা চলছে যে দেখছ না ধাঁধা !
খাল বিল পুকুরেতে—বঁড়লীর টোপ
উঠবেই মাছ জানি—কেবা ছাড়ে হোপ্ ।
সদাচার কদাচার—কত কি যে ছাই,
মাছের চারেতে ধরা—পড়ছে সবাই ।

— — —

কিশলয়ের দেলা ॥



"প্রযোগে ভরা গ্রামটি আমার

সে যে আমার জন্মভূমি।"

ছবি—ত্রীভঙ্গ্য বণিক

মজার খবর ॥ সুনীল দাস

অচিনপুরে রাজা	নতুন লুকম হ'ল জাহির
নিতি এমে রাজ সভাতে	অচিনপুরের বুড়োবুড়ির
চিবিয়ে থাকেন সবার সাথে	বিনা ব্যয়ে দাঁত ধাঁধিয়ে
ভর্তি বাটি গরম গরম	দেবেন স্বয়ং রাজা ।
কড়াই-হোলা ভাজা ।	

দাঁত মাজে না মোটে যা'রা
পাঁচ ঘা বেত খাবে তা'রা
রাজার পাইক শিখিয়ে দেবে
গাঁটোতে দাঁত মাজা ।

ছোট খোকা-খুকু যা'রা	খোকা খুকু ইচ্ছামত
ভেবে তা'রা হ'ল সারা	লজেল পাবে যে চায় যত
কোকলা গালে শক্ত খাবার	আইন করে দিলেন রাজা,
কি করে খায় নেইতো উপায়	বিনা পয়সায় না দিলে সব
কড়াই-হোলা ভাজা ।	রাজ্য শুদ্ধ দোকানদারের
	হবে কঠিন সাজা ॥

মাছ রাঙা ॥ চরেন ঘটক

মাছরাঙা পাখীরে,
মাছ খাবি নাকি রে ?
খাবি তবে আয় না,
মিছে কেন বায়না ।
আমাদের ঝিলেতে,
মাছ খায় চিলেতে ।
তুই কেন খাবিনে,
পরে এল পাবিনে ।

হবে টের আমেলা,
সোজা নয় তা মেলা ।
খেতে যদি চাস তো,
পাবি বারো মাসতো ।
আয় উড়ে সাঁ করে,
পাখা মেলে হাঁ করে ।
ঠোট ভরে নিয়ে যায়,
মোরে কিছু দিয়ে যায় ।

পরমাণু ॥ শুভেন্দু ঘোষ

থোকা বলে ঠাক দিয়ে,
“তুনে যাও ওমা,
আমরাও কাটিয়েছি—
পরমাণু বোমা ।”
মা বলেন, “ভালো কথা—
তবু দেখো বাবা
পরমাণু, হয় নাকো
সিংহের খাবা ।”

চাৰ্ভিক

॥ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ॥

নৱেশ চন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী

[ভারত অভিযান]

[ৰেঙ্গুন হেড কোয়াৰ্টাৰ্চ—নেতাজী. শাহনাওয়াজ, দীলন, সায়গল, মোহনসিং, ঈয়ানং সমাসীন । অদূৰে পাঁহাড় শ্ৰেণী । তখন ভোৱ হয় নাট । লক্ষী স্বামীনাথন প্ৰবেশ কৰিলেন । এবং একখানা বক্তৃতা লেখা কাগজ সুভাষ বাবুৰ সন্মুখে দিলেন ।]

লক্ষী । নেতাজী, নারী বাহিনীৰ সৈন্যগণ,—সম্মুখ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰে যুদ্ধ কৰতে চায় ? তাদেৰ রক্ত দিয়ে লিখে চেয়েছে আপনাৰ অমুমতি ।

নেতাজী । সেবা কাৰ্যেৰও তো প্ৰয়োজন আছে ভগ্নী । বেশ, যুদ্ধ ক্ষেত্ৰে তারা যদি যেতে চায়, নিশ্চয়ই যাবে । ভাৰতৰ বীৰাঙ্গনা তোমরা, তোমাদেৰ আদৰ্শে ভবিষ্যত ভাৰতে প্ৰত্যেক নারী হ'বে বীৰ নারী । অভিযান সময় আসন্ন ।

লক্ষী । আমরাও প্ৰস্তুত নেতাজী । আমি তাদেৰ প্ৰস্তুত ৰাখি নেতাজী । জয় হিন্দ (লক্ষীৰ প্ৰস্থান)

[কয়েক জন বালক সেনাৰ প্ৰবেশ]

১ম জন । সম্মুখ ব্ৰনাঙ্গনে আমরা যাব না নেতাজী ?

নেতাজী । যাবে বৈকি ভাট । ভাৰতৰ বীৰ বালক তোমরা, মৃত্যুকে তোমরা জয় কৰেছো । যাত্ৰাৰ সময় আসন্ন, যাও তোমাদেৰ পৰিচালকেৰ আসাৰ স্তম্ভ অপেক্ষা কৰ ।

বালকগণ । জয়হিন্দ (প্ৰস্থান)

নেতাজী । কৰ্ণেল ঈয়ানং ?

কঃ ঈয়ানং । আদেশ করুন নেতাজী ।

নেতাজী । মহাত্মাগান্ধী, ভারতের স্বাধীনতার পবিত্র প্রতীক । সেই মহাপুরুষ এর নামকরনে যে সৈন্য বাহিনী ; তার দায়িত্ব তোমার উপরে ছাপ্ত করে আমি নিশ্চিত রইলাম । নির্দেশ অনুযায়ী তুমি তোমার সৈন্য পরিচালনা করবে ।

ঈয়ানং । নেতাজী, ভারতের স্বাধীনতার জন্তে এট জীবন আমি উৎসর্গ করেছি । আপনার আত্মগত্যা, নির্দেশ আমার জীবনের মূল মন্ত্র । গান্ধী বিগ্রেডের মর্যাদা যদি না রাখতে পারি আমার যেন মৃত্যু হয় ।

নেতাজী । জেঃ মোহন সিংহ । রাষ্ট্রপতি মোলানা আজাদ, সেই আদর্শ কমীর নামে আপনার অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে গৌরব দান করেছে—সেই গৌরব রক্ষার ভার আপনার ।

মোহন সিংহ । তা জানি নেতাজী । আপনার নির্দেশ ও আজ্ঞা প্রতিপালন করে আজাদ ত্রিগেডের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে আমার কোন ক্রটি হবে না । ক্রটি যদি আসে, মোহন সিংহ সেদিন প্রাণে জীবিত থাকবে না ।

নেতাজী । কঃ গুরুবক্স ধীলন ! তোমার অধীনে নেহেরু ত্রিগেড । পণ্ডিত নেহেরু—স্বাধীনতার একনিষ্ট সেবক । তাঁর নামের মর্যাদা তুমি অক্ষুন্ন রেখ ।

ধীলন । নেহেরু ত্রিগেড পরিচালনার যে গুরু দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেছেন, সে দায়িত্ব পালনে আমার শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত ব্যয় করব । ভারতের স্বাধীনতা আমার লক্ষ্য । নেহেরু ত্রিগেড সে লক্ষ্য হতে কখনও বিচ্যুত হবে না ।

নেতাজী । লেঃ কঃ সায়গল, তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছি সেই ভাবে তুমি রণক্ষেত্রে অগ্রসর হবে । সব সময় ধীলনের সংগে সংযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে । তোমরা সব প্রস্তুত ।

সকলে । প্রস্তুত ।

কিশলয়ের বেলা ॥

নেতাজী। কাপটেন শাহনাওয়াজ !

শাহনাওয়াজ। নেতাজী !

নেতাজী। তোমাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে ভাই। আমি জানি তুমি তুমি বীর, আমি জানি তুমি দুর্নিবার। ৩২০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি যে অভিযান করবে তা রোধ করতে কেউ পারবে না। তবু জিজ্ঞাসা করি, আমি সংবাদ পেয়েছি তোমার আপন সহোদর ঈংরাজের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। ভাই-এর প্রতি ভাই কি অস্ত্র ধারণ করবে শাহনাওয়াজ !

শাহনাওয়াজ। স্বাধীন ভারতের মুক্তি আমি দেখতে পাউ নেতাজী। পরাধীন ভারতের প্রাণি তাই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। দৈত্যের মোহিনী মায়ায় ঘুমিয়ে ছিলাম আমি, সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে আপনি আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন নেতাজী। আমি চিনি না হিন্দু, আমি চিনি না মুসলমান, চিনি না খৃষ্টান, শুধু চিনি স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ভারতবাসী।

নেতাজী। যাত্রার কাল আসন্ন। একুনি হবে অভিযানের সংকেত ধ্বনি আমি শুনতে চাই, যে ভাই, ইংরেজের হয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, তার প্রতি তোমার কর্তব্য ?

শাহনাওয়াজ। আমার কর্তব্য। আমার বিবেক আমার কর্তব্য। পথ চিনিয়ে দিয়েছে নেতাজী। শপথ করে আমি একদিন বলে ছিলাম, দেশ মাতৃকার উদ্ধারের জন্তে, ভারতের স্বাধীনতার জন্তে, আমি আমার জীবন, আমার সর্বস্ব উৎসর্গ করলাম। সম্মুখ সমরে যাত্রার আসন্ন সময়েও সেই শপথই আজ আমি করবো নেতাজী। ভারতে স্বাধীনতা আমার জীবনের ব্রত, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে কেউ যদি আজ বাধা দিতে আসে, হোক না সে আমার আত্মীয়, হোক না সে আমার সহোদর ভাই, আমার সমস্ত পরিবার—সকলকে কামানের গোলায় ধুলোর সংগে আমি মিশিয়ে দেব।

কিশলয়ের বেলা ॥

নেতাজী। এইতো মুক্তিকামী বীরের কথা। ধন্য তুমি বীর শাহনাওয়াজ। তোমাদের অধিনায়কদের দায়িত্ব নিয়ে আমার যা গর্ব, আমি জানি, সে গর্ব কোনোদিনই স্বর্ধ হবে না। অস্ত্রের সমস্ত কামনা আমার উন্মুখ হয়ে থাকবে তোমাদের সাকলোর পথের দিকে। এস শাহনাওয়াজ, গ্রহণ করো এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা। তুলে দেবো তোমার হাতে, স্বাধীন ভারতের মুক্ত মাটিতে এ পতাকা উত্তোলনের ভার রইল তোমার উপরে।

[শাহনাওয়াজ যেই মাত্র পতাকা গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটি বিরাট সংকেত ধ্বনি হইল—বুঝা গেল অভিযানের সময় আসিয়াছে। সকলে সচকিত হইলেন এবং নিজ নিজ স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।]

নেতাজী। অভিযানের সময় আগত। আমার প্রিয় বীরগণ! তোমারা প্রস্তুত হও। কর্ণেল ইন্সয়ং, নোহন সিং ধীলেন, সায়গল, শাহনাওয়াজ (প্রত্যেকে এ্যাটেনশন হইয়া salute করিল।) আরতো সময় নেই, তোমারা নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—দূরে—বহুদূরে—ঐ নদী ছেড়ে—ঐ জঙ্গল, ঐ পাহাড় পর্বত ছেড়ে আমাদের দেশ ঐ দেশ আমাদের জন্মভূমি—ঐ দেশে আবার আমরা কিরে যাবো। শোন, ভারত আমাদের ডাকছে—ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে। ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসী আমাদের ডাকছে—আস্বীয়েরা ডাকছে—অস্বীয়দের। 'ঐ, আরত' সময় নেই, গ্রহণ কর অস্ত্র, দেখ যে পথ তোমাদের সামনে—সে পথ তৈরী করে গেছেন আমাদেরই পথ প্রদর্শকগণ। আমরা অগ্রসর হবো সেই পথে, পথ করে নেব শত্রু সেনার ভিতর দিয়ে। ভগবান যদি চান, আমরা শহীদের মত মৃত্যুবরণ করবো। যে পথ দিয়ে আমাদের সৈন্যগণ দিল্লী পৌছবে—শেষ শয্যা গ্রহণ করবার সময় সেই পথ আমরা চূষন করবো। দিল্লীর পথ-স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।

কিশলয়ের মেলা

৭

সকলে। [সমস্তের] চলো দিল্লী।

[রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া গেল সমর বাহু ঞ্চত হইল সঙ্গে সঙ্গে মার্চের গান। মঞ্চের অগ্রভাগ অন্ধকার রহিল। পশ্চাতে সাদা পর্দায় আলোক পাত হইল রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে ভাগ হইতে। তাহাতে দেখা গেল নেতাজী বীর গর্বে আলো ভায়ায় দাঁড়াইয়া সৈন্য শ্রেণীর অভিযান দেখিতেছেন, সৈন্য বাহিনী, নারী বাহিনী, বালক বাহিনী একে একে সকলেই কুচকাওয়াজ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। মুখে তাহাদের সংগীত, হাতে তাদের জাতীয় পতাকা।

“অব্ দিল্লী চলো দিল্লী চলে দিল্লী চলেগে।

রোকেন হম্ কিসী কে রুকে তৈ ন রুকেংগে ॥”

[যতক্ষণ গান শেষ না হইবে ততক্ষণ সৈন্য শ্রেণী চলিতে থাকিবে : নেতাজী উৎসুক নেত্রে তাদের প্রতি চাহিয়া রইবেন।]



বাংলাদেশ-এর আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি

রেজার্ডেল ইক মানিক

কায়ার হেড কোয়ার্টার

৫, সিমসন রোড, ঢাকা-১

ফোন-২৪২ ৬২২



অভিযুখের দর্পণে

« সবচেয়ে বড় আশা বড় ছবার »

কল্লোল ত্রিপাঠী

তখন আমি কত ছোট। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। শিশুস্বর্গ সংগঠন হতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হবে। সে কি আনন্দ। বাবার কাছে অনুমতি পেয়ে গিয়েছি। শিশুর মেলা বসেছে। দিল্লীতে গিরে পৌঁছাপান। দর্শনীয় স্থানগুলো একের পর এক দেখে চললাম। ভূগোলের স্থানগুলো চোখের সামনে সত্যি-কারে ভেসে উঠলো। আমি এক দৌড়ে লালকেল্লায় উঠে পড়লাম। সারা শহরটা মনে হলো আমার মুঠোর মধ্যে। সেই আনন্দের কথা বলতে লাগলো ছোট্ট শিশু অঙ্কন শিল্পী কল্লোল ত্রিপাঠী।

ছোটবেলা হতে রং আর তুলি বাড়ীতে দেখতাম এবং বাবা (শিল্পী সুব্রত ত্রিপাঠী) সেই সব নিয়ে ছবি আকতেন শুধু। সেই দেখে

আমার খুব ভাল লেগে গেল। তাই কোন ফাঁকে আমিও রং-তুলি তুলে নিলাম হাতে। এর মূলে সবার আগে আমায় বাবারই কথা মনে পড়ে। তিনিই বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। সব সময় আমার পাশে পাশে থেকেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। এই দেখুন আমাদের দেখা দেখি পাঁচবার আমার ছোট্ট ভাই কৌশিক ত্রিপাঠী হাতে রং-তুলি ধরে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সে বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েগিয়েছে।

সাক্ষাৎকার

আমি তখনও পর্যাপ্ত মূলে ভর্তি হইনি। আমার একটা ঝাঁক। জনসেবক কাগজে সপ্তডিক্কা বিভাগে প্রকাশ হয়েছে। আমি দেখে তো হতবাক। বাড়ীর সবাইকে দেখিয়ে এবং অজ্ঞাতদের দেখানোর জন্ত ছুটলাম। সে কী মনে আনন্দের জোয়ার। সেই জোয়ার সেদিন কেউই রুখতে পারেনি। তারপরে অবশ্য আমার ঝাঁক আনন্দ-বাজার, যুগান্তর, স্বপ্নবুড়ি, রোশনাই প্রভৃতি আরো অনেক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি এই ফাঁকে কল্লোলকে বললাম--আচ্ছা ভাই তুমিতো “ছবির মেলা চড়ার খেলা” পুস্তকের প্রচ্ছদ পট করেছ। এক গাল হেসে বলল—হ্যাঁ। এই বইতে আমার ভাইএরও ঝাঁক ছবি আছে। আমি এখন জগদ্বজ্জ্ব ইন্সটিটিউশন-এ নবম শ্রেণীতে পড়ছি। এই মূলের মুখপত্রেরও প্রচ্ছদ পট একেছি।

বিখ্যাত অঙ্কন শিল্পী যামিনী রায়ের ঝাঁক একে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা দেয়। তাতেই বুদ্ধি একের এক এক পুরস্কারের সম্ভার এর হাতে এসেছে। এর এই পুরস্কারে লাভে অঙ্কন শিল্পে আরো উন্নতির পথ প্রশস্ত করে তুলেছে।

কিশলয়ের মেলা ॥

১৯৭৫ সালে সারা বাংলা আনন্দমেলা (আনন্দবাজার পত্রিকা) অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ । সঙ্গে সঙ্গে কল্লোল জানিয়ে দিল আমার ভাই এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করে এবং ওর আঁকা দিয়ে প্রচ্ছদপট হয় শারদীয়া আনন্দমেলা । তাবদে শিশুস্বর্গ (মহাজাতি সদন), নেহরু মিউজিয়াম, ২২-পল্লী, সুভাষ উদ্দ্যান, ত্রিকোন পার্কের প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যে পুরস্কৃত হয়েছে ।

বন্ধুমহল আমার খুব ভাল লাগে । তাই অবসর সময় আমি খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকি । বিশেষ করে ক্রিকেট আমার প্রিয় খেলা । স্কুলে আমাদের স্কুলের ছাত্র রাজা মুখার্জী । তা'হলেই বুঝতে পারছেন । বাকি সময়টা আমি রহস্য রোমাঞ্চ আর শিকার কাহিনী পড়েই কাটিয়ে দিই । তা বাদে আমার হবি—ডাক টিকিট সংগ্রহ করা । আর তাহলে সময়টা কি করে থাকবে ।

আমি বললাম তোমার সবচেয়ে বড় আশা কি ?—হেসে বলল “আমি বড় হব ।”





॥ সার্কাস ॥

তপন কুমার চৌধুরী

[শিশু মাটিকা]

[পাশাপাশি দুটো জানলায় দেখা যাচ্ছে দুটো মুখ । একজনের নাম টুকুন আরেক জনের নাম রিঙ্কু ! তোমরা কী চেনো ওদের ? ভারী বন্ধু ওরা দুজনে ! আর কী সুন্দর দেখতে ওদের ! রিঙ্কুর এক মাথা চুলে টুকটুকে লাল একটা রিবণ বাঁধা ! পরেছে ধবধবে সাদা একটা ফ্রক ! ঠিক যেন একটা ফুট ফুটে সাদা হাস ! আর টুকুন ? ও তো দারুণ ফিট্ কাট্ ! আর হবে নাষ্ট বা কেন—পড়ছে যে ক্লাস ফোরে ! রিঙ্কুর চাইতে এক ক্লাস ওপরে ! এসোনা—কিছুটা সময় আজ আমরা ওদের সাথে কাটিয়ে দিই—]

টুকুন আর রিঙ্কু গলা মিলিয়ে গাইছে—



আকাশ বাতাস আজ সেজেছে

কী অপূরণ সাজে—

সেই ছবিতে চোখ ভরে নিই

মন ভরে না কাজে ।

পড়া-টড়া নেই আজই

খুলছি নাকো বই—

মন জুড়ে তাই খুলীর বাশী

যাচ্ছে বেজে ওই !

টুকুন—জানিস রিঙ্কু, সোনাডাঙার মাঠে তার পড়েছে । সার্কাস হবে !

কিশলয়ের মেলা ॥ ৮১

রিজু—তাই নাকি ! তাই নাকি !! কী আনন্দ—কী আনন্দ !
কাকুর সাথে বিকেলে যেতেই হবে সার্কাস দেখতে ! আচ্চা টুকুন,
সার্কাসে কারা কারা আছে রে ?

টুকুন—সব্বাই আছে ! বাঘ আছে—তা-ও আবার যাতা বাঘ
নয়, দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ! বইতে পড়িসনি রয়েল বেঙ্গলের
কথা এক লাফে ওরা একেবারে গাছের মাথায় উঠে যেতে পারে !

রিজু (গালে হাত রেখে)—তাই নাকি ! আমার যে দারুণ ভয়
করে !

টুকুন (হেসে)—দূর ! ভয় কিরে ! সার্কাসে যখন ওরা খেলা
দেখায় না—তখন তো আফিএ বৃদ্ হয়ে থাকে ! চোখে ঝাপ্সা
দেখে ! অতো লোকের মধ্যে তোকে আর আমাকে চিনবেই না কী
করে বল !

রিজু—আর কী আছে ?

টুকুন—আর আছে সিংহ ! সিংহটা কী করবে জানিস হাতীর
পিঠে আরাম সে ঘুরবে আর সন্ধ্যাবে সেলাম জানাবে ! তারপরে
আছে উট ! তুই আগে কখনো উট দেখেছিস, রিজু ?

রিজু—উট ! দেখিনি তো ! তবে উটের কথা বইতে পড়েছি !
উটকে ‘মরুভূমির জাহাজ’ বলে !

টুকুন—ঠিক বলেছিস ! তারপর দেখতে পাবি জল হস্তীকে—

রিজু—ওরে বাক্বা ! জলহস্তী আমি চিড়িয়াখানায় দেখেছি !
ইয়া বড়া ঠা—তোকে আর আমাকে এক সাথে সপাৎ করে গিলে
খেতে পারে—

(হঠাৎ বাটারে এক সাথে শোনা যাবে অনেক জন্তু-জানোয়ারের
ডাক ! টুকুন আর রিজু অবাক বিষ্ময়ে এদিক ওদিক চাইতে
থাকবে ।)

রিজু—ওমা ! কারা যেন ডাকছে না !

কিশোরের মেলা

টুকুন—তাটতো ! আর ডাকগুলো যেন খুব তাড়তাড়ি এগিয়ে আসছে এদিকে ! নিশ্চয়ই সার্কাসের জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে !

রিজু—তবে কী হবে এখন ! আমরা বরং জানলা বন্ধ করে দিই !

টুকুন—না—না ! জানলা বন্ধ করে কী হবে ! তার চাউতে ওদের মজাটা দেখা যাক না !

(একটু পরেই টুকুন আর রিজুর জানলার সামনে একে একে হাজির হবে বাঘ-সিংহ-হাতি-উট-জলহস্তী ! সবাই নেচে নেচে গাউতে থাকবে—)



খাঁচা ভেঙে বাইরে এসাম
আজ কী খুশী ভাট—
সবাই মিলে মিলিয়ে গলা
আনন্দে গান গাই !
এখন মোদের ছুটি কেবল
নেইকো কাজের তাড়া—
চিংকারেতে আজকে যে তাই
মাতিয়ে তুলি পাড়া !!

বাঘ—আজ থেকে আমরা স্বাধীন ! আর আমরা খাঁচায় ফিরে যাচ্ছি নে ।

সিংহ—ঠিক বলেছে বাঘ ভায়া ! এখন থেকে কেউ আমাদের ওপর আর খবরদারী করতে পারবে না ! স্বাধীন ভাবে আমরা যা খুশী তাই করবো !

উট—হ্যাঁ—হ্যাঁ ! আমিও তাই বলছিলাম ! রাতের পর রাত জেগে আর আমরা খেলা দেখাবো না ! শুনবো না সার্কাসের ঐ বড়ো বড়ো আর মোটা মোটা লোকগুলার কথা !

কিশলয়ের ঘেল।

জলহন্তী—আঃ! কী আনন্দ আজ আমাদের! কত বছর
বাদে আবার আমরা ফিরে পেলাম মুক্তির আনন্দ!

বাঘ—তাইতে, বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি!

টুকুন—তবে যে আমাদের সার্কাস দেখা হবে না! তোমরা না
খাকলে কে আমাদের খেলা ছাখাবে!

(জঙ্ঘ-জানোয়ারেরা সবাই মুখ তুলে টুকুন আর রিঙ্ক দিকে চায়!
টুকুন আর রিঙ্ক একটু যেন ভয় পেয়ে যায়!)

বাঘ—তোমরা আবার কে? সার্কাসের মোটা লোকদের পুচ্কে
ছেলে-মেয়ে নাকি!

রিঙ্ক—না-না আমরা সার্কাসের কেউ নই! আমার নাম রিঙ্ক। আর
ও হলো টুকুন। আমরা দুজনে বন্ধু।

বাঘ—তাই বলো। আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।
ভাবলাম, আমাদের ধরে আবার খাঁচায় পুরে দেবে নাকি কে জানে।

টুকুন—কি যে বলো তুমি? তোমরা খাঁচা ভেঙে বাটরে এসে
আনন্দ করছো, এতে আমাদেরও যে আনন্দ—

সিংহ—বাঘ ভায়া, টুকুন যেন কী বলছিল—

বাঘ—ও হ্যাঁ। (টুকুনকে) তুমিই বুঝি বলছিলে আর তোমাদের
সার্কাস দেখা হবে না, তাই না? (টুকুন আর রিঙ্ক একসাথে মাথা
নাড়লো)

উট—সত্যিই তো! ওরা যে আর আমাদের খেলা দেখতে
পাবে না!

জলহন্তী—এখন কী করা যায়।

হাতী—চটপট একটা বুদ্ধি বের করে ক্যালো!

টুকুন—এসো না, আমরা কয়েকজন মিলে একটা সার্কাস পাটি
তৈরী ক'রে ফেলি!

বাঘ—চমৎকার আইডিয়া ! একেই বলে মানুষের মগজ ! এই,
তোমরা সবাই রাজী আছে তো ?

সবাই সম্মত—আমরা রাজী—রাজী—রাজী—

রিঙ্ক—কী আনন্দ - কী আনন্দ !

বাঘ—বাস, চটপট একটা নাম তৈরী করে ফেলো তো সার্কাসের
সিংহ—‘টুকুন আর রিঙ্ক ঝাঙ্গীনানীর সার্কাস’।

বাঘ—ঠিক ঠিক ! এসো টুকুন আর রিঙ্ক, বাইরে এসো ! চলো
আমরা চলে যাউ এ দূরের মাঠে ! সেখানে শুরু হোক আমাদের
সার্কাস !

(টুকুন তার রিঙ্ক বাইরে এসো)

বাঘ—টুকুন, তুমি ওঠো আমার পিঠে—

সিংহ—রিঙ্ক আমার পিঠে !

(টুকুন বাঘের পিঠে, রিঙ্ক সিংহের পিঠে চেপে বসলো । তার
পর সবাই সারি বেঁধে এগিয়ে চললো গাইতে গাইতে—)

—(যবনিকা)—

টি, ডি, টেলার্স,

স্টেশন রোড, (পশ্চিম)

নববারাকপুর

২৪-পরগণা

— : আমাদের কথা : —

কমলারজন বিশ্বাস

শারদীয় উৎসব আসন্ন। দেবী কাত্যায়নী আবাহনের জন্ত চারিদিকে প্রস্তুতি চলেছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটময় মুহুর্তে ও আমরা সমস্ত কষ্ট ও সমস্তা ভুলে গিয়ে আনন্দ চিত্তে জাতীয় উৎসব সার্থক ভাবে পালন করার জন্ত তৈরী হয়ে নিচ্ছি। এটাই আমাদের কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক জীবন। এই শুভদিনে আমি এই পত্রিকা কিশলয়-এর মেলার মাধ্যমে শিশু কল্যাণ ধর্মি—নববারাকপুর অঞ্চলের কিশলয় সবপেয়েছির আসন্ন সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য সর্ব সাধারণের অবগতির জন্ত লিখছি।

যুগান্তর পত্রিকা পাতভাড়ির একটি শাখা আসন্ন হ'ল এই “কিশলয় সব পেয়েছির আসন্ন। সব পেয়েছির আসন্নের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সর্বজন বিদিত। এতদ্ অঞ্চলের শিশু কল্যাণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সনের ২৩শে জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই আসন্ন। দীর্ঘ সত্তর বৎসর ধাবৎ জন সাধারণের সহায়ত্ব ও শুভেচ্ছা পাথের করে আসন্ন তার সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছে।

এখানে আমি বিগত এক বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি। আসন্ন সোনার কাটি ভাট ও বোনের সংখ্যা বর্তমানে ১৭৫ এবং ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কর্মী পরিষদ ওই আসন্ন পরিচালনা করে থাকে।

প্রত্যেক বিভাগে কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্ত এক বা একাধিক কর্মী সদস্যের দায়িত্ব নিয়রূপ দপ্তর ভাগ করা হয়েছে। দপ্তর, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ, ত্রুটচরী, শিবির, কিশলয়ের মেলা।

শিক্ষণ, পাঠাগার, সাহিত্য, নৃত্য-গীত ও পত্রিকা, । প্রতিটি বিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্মীকে সচিবের মর্যাদা দেওয়া হয় । প্রত্যেক বিভাগের মধ্য সমন্বয় সাধনের জন্ত একজন প্রধান সচিব নিযুক্ত আছেন । সোনার কাঠি ভাট, বোনদের মুখপত্র হিসাবে একজন সত্যসেবী ও একজন সচঃ সত্যসেবী নিযুক্ত আছে । আমাদের আসর থেকে এবার চারজন সত্যসেবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ।

আসরের মুখ্য কাজ বায়াম, কুচকাওয়াজ, প্রত্‌চারী, ছড়া, খেলা ধূলা প্রভৃতি সুদৃষ্টভাবে চলেছে । গত মার্চ মাসে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয় এবং ১৯শে আগষ্ট আসরের প্রধান সচিব পঙ্কজদেব পরিচালনায় অভি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের পর বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয় । এবারও পুরস্কারে সামগ্রীর কিছুটা অংশ সংগ্রহের জন্ত সহন্বয় শিশু দরদী অভিভাবকদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি । আমি কিশলয় আসরের পক্ষে তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । ফুটবল ও ভলিবল খেলা ও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । কিশলয় গীত বিভাগের একটি আদর্শ সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র । এখানে প্রত্যেক পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । এই বিভাগটি সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে । পাঠাগার বিভাগের জন্ত একটি আলমারির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে । বছরদিনের ইচ্ছা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হ'ল । পাঠাগারে পুস্তকের সংখ্যা উন্নতির করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । পাঠাগার গৃহটি বিপদজনক অবস্থা থেকে গৃহটিকে সংস্কার করা হয় ।

সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র-নজরুল জন্ত জয়ন্তী সাড়ম্বরে পালন করা হয় এবং অজ্ঞান মনীষীদের জন্মদিন ঘরোয়া ভাবে উদযাপিত হয় । ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্ম দিবস ও আসরের প্রতিষ্ঠা দিবস মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হয় । মূল কেন্দ্রের পরিচালিত চারটি শিবিরে আসর যোগদান করে এবং সাক্ষাৎ অর্জন করে ।

পঞ্চ বর্ষে আমাদের এই পত্রিকায় অতিক্রম করল। এতদ্ সকলে শিশু ও কিশোর সাহিত্য হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাইরে পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। প্রচারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। কিশলয়ের মেলা ছোটদের লেখায় উৎসাহিত করে এবং তরুণ লেখকদের লেখায় অগ্রাধিকার দেয়। পত্রিকা প্রকাশে সাহায্যে ধারা এগিয়ে এসেছেন তাদের জানাট আন্তরিক অভিনন্দন।

আসরের হিসাব পরীক্ষক শ্রীশিবনাথ মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত যত্নেব সঙ্গে আসরের হিসাব পরীক্ষা করেছেন: তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

এবনি মুহুর্তে বিনামূল্যে বহুপাতের মতো সংবাদ এসে পৌঁছল আমাদের প্রিয় সোনার কাঠি ভাট মনৌষ মজুমদার (কল্পীনাথ) সমাজিক ট্রেন হুর্থটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তি হোক এই কামনা করি।

আসরের অভিভাবক মণ্ডলীর সভাপনকে জানাই অভিনন্দন। শিশুতীর্থ এই কিশলয় সব পেয়েছির আসর অভিভাবক ও জন সাধারণের স্নেহ ধন্য। শিশু দরদী প্রতিটি সাধুদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করে আমার কলম বন্দ করলাম।

—০—





নতুন ভট্টাচার্য্য

এবারের ধর্মার

নেই তাই খালি থাকলে কি আর পেতে,
নিজানা মাতুর ভেঁড়ে কি আর খালি মেয়ে শুতে,
অনেক খরচ করলে তবে একটখানি পাবে,
কপাল ভাল চলে পরে বিনা দামেই হবে,
ছোট্ট সোনার বকুড়া ভাঙে
তিন অক্ষরে নাম মোর, বলা চাই চাই !

“মনীষা সুর”

চার অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে জানে,
একট জন্মে ছুটি রূপ বল দেখি তবে ।
প্রথম রূপেতে হয় অতি বিষধরী,
দ্বিতীয় রূপেতে হয় পবিত্রমুন্দরী ।

“স্বদেশ রঞ্জন দাস”

ধর্মার উত্তর আগামী ২০/১১/১৪ তারিখের মধ্যে সম্পাদকের কাছে পৌছানো চাই ।

৫ গত সংখ্যায় ধর্মার উত্তর সজনে ভাঙে।

গত সংখ্যার ধর্মার উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে তাদের নাম নিচে দেওয়া হলো :—

আশান্ত্র চক্রবর্তী, জয়ন্তী চক্রবর্তী, জয়দেব চক্রবর্তী, পম্পা সিংহ,
দীপা ভট্টাচার্য্য, শীলা দাস, মিতালী দাস ইতু দাস, রীতা বিশ্বাস,
বাবলি দাস, সোমা ভট্টাচার্য্য, হরেন চাইত, নরেন চাটাজী, কৃষ্ণা
চক্রবর্তী, দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য, স্বপ্না দাস, সুমিতা চন্দ্র, সুমিতা দেব,
মৌসুমী চক্রবর্তী, স্তপা চন্দ্র, উৎপল চক্রবর্তী, চম্পা দাস, মুনমুন
মজুমদার, চঞ্চল চক্রবর্তী, জবা চক্রবর্তী, রাধি বসু, শঙ্করী সমাদ্দার,
কাকলী চক্রবর্তী, নমিতা দে ।

অমর মেলা

১৯৭৪ সালের কণ্ঠ্য পরিষদ

অভিভাবক মণ্ডলী

সভাপতি—শ্রীযুক্ত যুক্তি কুমার বসু,

সংঘমিত্র—শ্রীযুক্ত কমলা রজন বিশ্বাস

সহ-সংঘমিত্র—শ্রীযুক্ত তরিন্ কান্তি চক্রবর্তী

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীশিবনাথ মজুমদার

সহসভাপতি—ডাঃ সৌরেন্দ্র নারায়ণ বসু, শ্রীল কুমার বসু,

শ্রীল চক্রবর্তী, রঞ্জিত ভট্টাচার্য্য ও মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সচিব মণ্ডলী .

প্রধান সচিব—শিবির—শিক্ষক—অতচারী ও ছড়া :—পঙ্কজ কুমার দে

দত্তর সচিব :—শ্রীশ্যামল কুমার বসু, ক্রীড়া সচিব :—শ্রীমুখোপাধ্যায় সিংহ

নাঃয়াম ও কুচকাওয়াজ :—প্রবোধ ব্যানার্জী, সাংস্কৃতিক সচিব :

আনন্দ বিশ্বাস, গীতবিতান সচিব :—তপন মিত্র, পত্রিকা সম্পাদক

:—নিখিলেন্দু চক্রবর্তী, পাঠাগার সচিব :—পুলক চৌধুরী ও

অনিল চক্রবর্তী

সাধারণ কণ্ঠ্য—সোমনাথ মজুমদার, অনাদি মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত

রায়, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, সুজিত চৌধুরী, রবি দত্ত, রজত

রায়, রেবা চক্রবর্তী, রত্না ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতা বসু।

সভাসেবী—শ্রীগোতম কুমার বসু, সহ সভাসেবী—সিতাংক বিশ্বাস

জলজৈতা (সোনারকাঠি বিভাগ)

গুরুজী—শ্রীকুমার দাস, ঝাঙ্গা রাণী—অপা দাস, যুথিকা ব্যানার্জী সহঃ)

নেতাজী ও সাধারণ—প্রধান কণ্ঠ্যর তদাবধানে, শ্রীমা—সোমা

ভট্টাচার্য্য, কানন দাস (সহঃ)

রবীন্দ্রনাথ } —অয়দেব চক্রবর্তী, মাতাঙ্গিনী—শীলা দাস,

সাধারণ— } স্বাতি বসু (সহঃ)

মজুমদার শ্রীবীর বসু

—ঃ কৃতজ্ঞতা জানাই ঃ—

Meteor Private Ltd., Calcutta.

Bharat Seva Nidhi, Calcutta.

প্রকৃতি সংগঠন,

অধ্যাপক বি: সেন, সর্বস্বত্বী অমিতাভ চ্যাটার্জী, দিলীপ দাস,

জ্যোতিষ দেবিন্দ্রাস, সরল দে, তুষীর চক্রবর্তী প্রমুখ

প্রতিটি বিজ্ঞাপন দাতা।

প্রতিটি গ্রাহক-পাঠক-বিক্রেতা।

সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে।

সম্পাদক—কিশোর এন মেলা

With best Compliments from



M/s. Nootan Chemical Industries

4/1, Ahmed Mamooji Street,

Lilooah, Howrah.

কিশোর এর মেলা ★ বর্ষ-৪ সংখ্যা-২৪ রেঃ নং—১৮৪৯০/৭১

প্রখ্যাত ঘোষ কোম্পানীতে রিজার্ভ ব্যাক্তের নির্দেশানুযায়ী
সহায়ী আশ্রয়িত রাখিয়া বাৎসরিক

১২% হইতে ১৮% উপার্জন করুন

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ইণ্ডিয়ান ফিবার্স প্রাইভেট লিমিটেড কোং

১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কলিকাতা-১

ফোন নং ২৩-৪২৬৯

SKYLIGHT

LAMP

FOR CONSCIOUS BUYERS

DEMANDING

QUALITY & LASTING

Jupiter Lamp Mfg. Industries

21-B, Dr. Jagabandhu Bose Lane

Calcutta-700009

পূর্ণবল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত ও ফ্যান্সি আর্ট প্রেস, ১০ নং মদন
বড়াল লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—এক টাকা।